ইউনিট ২
বাংলা ভাষা শিখনে অন্যান্য দক্ষতার উন্নয়ন

অধিবেশন ১ : বাংলা ভাষা শিখনে অন্যান্য দক্ষতার উন্নয়ন : বাংলা বানানরীতি

অধিবেশন ২ : প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ, চর্চা ও অনুশীলন

অধিবেশন ৩ : বানানশিক্ষণ পদ্ধতি

অধিবেশন ৪ : বাংলা উচ্চারণ : উচ্চারণরীতি

অধিবেশন ৫: বাংলা উচ্চারণ : সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণরীতি

ইউনিট ২ **অধিবেশন ১**

বাংলা ভাষা শিখনে অন্যান্য দক্ষতার উন্নয়ন : বাংলা বানানরীতি

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা জানি ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম। এ যোগাযোগ সাধিত হতে পারে বিভিন্ন উপায়ে। যেমন- লিখিতরূপে বা মৌখিকভাবে। মৌখিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বানান থাকে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু লিখিত যোগাযোগের ক্ষেত্রে বানান একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বানান ভুল বা হেরফেরের কারণে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- শুদ্ধ বানানে লেখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা বানান ভুলের কারণ ও সমাধান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- বাংলা বানান ভুলের প্রকৃতি নির্ণয় করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : শুদ্ধ বানানে লেখার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপের অপরিহার্য অঙ্গ হল শুদ্ধ বানানরীতি। মুখের ভাষায় বানান প্রচ্ছন্ন থাকে। পড়ার জন্য বানান প্রয়োজন, কিন্তু শুদ্ধভাবে লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ বানানের উপরই ভাষার উচ্চারণশুদ্ধতা ও অর্থময়তা বহুলাংশে নির্ভর করে।

বাংলা ভাষায় রয়েছে দুটি ‘‘ই” (ই, ঈ), তিনটি ‘‘শ” (শ, ষ, স), দুটি ‘‘উ” (উ, ঊ) বর্ণ । এছাড়াও বাংলা ভাষায় রয়েছে দেশি, বিদেশি, তদ্ভব, অর্ধতদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দের বিশাল ভান্ডার। এই শব্দগুলো শুদ্ধরূপে লেখার জন্য প্রণীত হয়েছে প্রমিত বানানরীতি, যা আয়ত্ত না করলে শুদ্ধভাবে লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভাষার যথার্থ ভাব প্রকাশ ও শুদ্ধ অনুশীলন ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে প্রশিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অসচেতনতার ফলে ভাষাচর্চার দিকটি অবহেলিত থাকে। তাই মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশকে অর্থময়, সার্থক ও যথার্থ করতে হলে শুদ্ধ বানানরীতি আত্মস্থ করা প্রয়োজন।

পর্ব-খ : বাংলা বানান ভুলের কারণ ও প্রতিকার

বিভিন্ন কারণে লেখায় বাংলা বানানের ভুল হতে পারে। যেমন- একাগ্রতা, নিষ্ঠা ও অনুশীলনের অভাব। দুর্বল ব্যাকরণ জ্ঞান ইত্যাদি। এ কারণগুলোর প্রতিবিধানও সম্ভব। নিম্নে বানান ভুলের কারণসমূহ উল্লেখ করা হল। আপনি এর প্রতিবিধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ লেখার চেষ্টা করুন।

বানান ভুলের কারণ :	**বানান ভুলের প্রতিবিধান :**
১। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিগত দুর্বলতা।	১।
২। মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, নিষ্ঠা ও	২।
৩। একাগ্রতার অভাব।	৩।
৪। বানান শুদ্ধ করে লেখায় অনুশীলনের অভাব।	৪।
৫। ব্যাকরণ জ্ঞানের অভাব।	৫।
৬। পরিবেশের প্রভাব।	৬।
৭। ত্রুটিপূর্ণ পাঠদান পদ্ধতি।	৭।
৮। বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, সংবাদপত্র ও পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ প্রমাদ।	৮।
৯। শিক্ষকের ত্রুটিযুক্ত বানান সহ পাঠদান পদ্ধতি।	৯।
১০। আঞ্চলিকতার প্রভাব।	১০।
১১। অভিধান ব্যবহারে অনীহা ও অজ্ঞতা।	১১।

প্রতিবিধানের কারণসমূহ লিখতে ব্যর্থ হলে মূল শিখনীয় বিষয়ের সাহায্য নিন।

পর্ব-গ : বানান ভুলের প্রকৃতি

১। বর্ণমালা ঘটিত বানান ভুল। স্বরধ্বনি উচ্চারণে হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা রক্ষা করতে না পারা। যেমন - ই, ঈ, উ, ঊ - যুক্ত শব্দের বানান। দিন - দীন, ধনী - ধ্বনি ইত্যাদি।

২। ণ-ন, জ-য, শ-ষ-স এসব ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রে উচ্চারণগত পার্থ্যক্য না থাকলেও বানানের পার্থক্য রয়েছে। যেমন - আপন-আপণ, জান-যান, শব-সব প্রভৃতি।

৩। যুক্তবর্ণের ব্যবহারে বানান সমস্যা হয়। যেমন: ছন্দ-দ্বন্দ্ব, মহাত্ম্য-আয়ত্ত।

৪। যুক্তাক্ষর লেখার আকারগত পার্থক্য নিরূপণ করে স্পষ্ট বানানে লিখতে হবে। যেমন- বক্র-শত্রু, অরুণ-অরূপ প্রভৃতি।

৫। উচ্চারণ ঘটিত সমস্যা। যেমন - সমোচ্চারিত শব্দ: সব-শব, শিকার-স্বীকার, দ্বারা-দারা প্রভৃতি। উচ্চারণ ভ্রান্তি - বেলা (সময়), বেলা (সাগরের বেলাভূমি)।

৬। আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার ও উচ্চারণের কারণে বানান ভুল হয়ে থাকে। যেমন - দুপর-দুপুর, পনর-পনের, সতর-সতের, আঠার-আঠের প্রভৃতি।

৭। যুক্তাবর্ণ উচ্চারণ ত্রুটির কারণে বানান ভুল হয়। যেমন -অমৃত- অমমৃত (অতিরিক্ত ধ্বনির আগমন ঘটিয়ে উচ্চারণ প্রবণতা), আবৃত্তি- আববৃত্তি প্রভৃতি।

৮। যুক্তাক্ষরে রেখা বিন্যাসে সাদৃশ্য না থাকলে বানান ভুল হয়ে থাকে। যেমন- সম্মান (সম+ম+আ+ন)- সন্মান (ভুল উচ্চারণে সনমান = স+ন+ম+আ+ন)।

৯। আনুনাসিক উচ্চারণে বলা বা পাঠের কারণেও বানান ভুল হয়ে থাকে। যেমন - কাচ-কাঁচ, পাপড়ি- পাঁপড়ি, কাটা-কাঁটা ইত্যাদি।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ১**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলা ভাষা শিখনে অন্যান্য দক্ষতার উন্নয়ন : বাংলা বানানরীতি

ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপের অপরিহার্য অঙ্গ হল শুদ্ধ বানানরীতি। ভাষার শুদ্ধ লিখিত রূপের পরিপূর্ণতা আনে শুদ্ধ বানান। তাই ভাষা শেখার পরই এর বানান শিক্ষাদানে শিক্ষককে সচেতন তৎপরতা অনুসরণ করতে হবে। শব্দের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন বর্ণের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটাতে হবে। বর্ণমালার সঠিক জ্ঞান অর্জনে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে, সঠিক শব্দ গঠনে সহায়তা দিয়ে এর পর তাদের বানান লেখায় মনোযোগী করতে হবে।

মুখের ভাষায় বানান প্রচ্ছন্ন থাকে। পড়ার জন্য বানান প্রয়োজন, কিন্তু শুদ্ধভাবে লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানান প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কারণ বানানের উপরই ভাষার উচ্চারণ শুদ্ধতা ও অর্থময়তা বহুলাংশে নির্ভর করে। বাংলা ভাষায় রয়েছে দুটি ‘‘ই” (ই, ঈ) , তিনটি ‘‘শ” (শ, ষ, স), দুটি ‘‘উ” বর্ণ (উ, ঊ)। এছাড়াও বাংলা ভাষায় রয়েছে দেশি, বিদেশি, তদ্ভব, অর্ধতদ্ভব, তৎসম, অর্ধতৎসম শব্দের প্রচুর শব্দভান্ডার। এই শব্দগুলো শুদ্ধ রূপে লেখার জন্য প্রণীত হয়েছে প্রমিত বানানরীতি, যা আয়ত্ত না করলে শুদ্ধভাবে লেখা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ভাষার যথার্থ ভাব প্রকাশ ও শুদ্ধ অনুশীলন ব্যাহত হয়। এ বিষয়ে প্রশিক্ষক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের অসচেতনতার ফলে ভাষাচর্চার দিকটি অবহেলিত থাকে। তাই মাতৃভাষায় শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রকাশকে অর্থময়, সার্থক ও যথার্থ করতে হলে শুদ্ধ বানান রীতি আত্মস্থ করা প্রয়োজন ও গুরুত্বপূর্ণ।

অশুদ্ধ বানানে লেখার প্রবণতা ভাষা ব্যবহারে লেখকের হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের লিপিরূপ ও উচ্চারণে সমন্বয়ের প্রয়োজনেও শুদ্ধ বানান রীতি আত্মস্থ করে পড়তে ও লিখতে হবে, (যেমন: বন্ধ-লিপিরূপ, বোন্ধ-উচ্চারণ রূপ, নম্র-লিপিরূপ, নম্র-উচচারণ রূপ)। বানানের শুদ্ধ রূপটি জানলেই পঠন, উচ্চারণ, বলা ও লেখায় মাতৃভাষা সম্পর্কে বাস্তব উপলব্ধি, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ জাগে। শুদ্ধভাবে ভাষা বলা ও চর্চায় কোন বিরোধ থাকে না। মাতৃভাষা বলা, পড়া, লেখা ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড চর্চার মাধ্যমে ভাষা দক্ষতা অর্জন সুনিশ্চিত হয়।

বানান ভুল বা হেরফেরের কারণে যোগাযোগে অসুবিধা ঘটে। সঠিক যোগাযোগ স্থাপনে শুদ্ধ বানানে ভাষা লেখার দিকটি গুরুত্ববহ।

বানান ভুলের কারণ ও প্রতিকার

বানান ভুলের কারণ :	বানান ভুলের প্রতিকার :
১। প্রাথমিক শিক্ষার ভিত্তিগত দুর্বলতা।	১। প্রাথমিক স্তর থেকে বানান ভিত মজবুত করা।
২। মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার অভাব।	২। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।
৩। বানান শুদ্ধ করে লেখায় অনুশীলনের অভাব।	৩। প্রাথমিক স্তর থেকেই সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে বানান শুদ্ধ করে লেখার চর্চা করানো।
৪। ব্যাকরণজ্ঞানের অভাব।	৪। শুদ্ধ ব্যাকরণজ্ঞানসহ বানান শেখানো।
৫। পরিবেশের প্রভাব।	৫। শিক্ষা জীবনের শুরুতেই শুদ্ধ বানান শেখা ও শেখার গুরুত্ব প্রদায়ী পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৬। ত্রুটিপূর্ণ পাঠদান পদ্ধতি।	৬। বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পাঠদান।
৭। বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, সংবাদপত্র ও পাঠ্যবইয়ের মুদ্রণ প্রমাদ।	৭। পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত বানান শুদ্ধতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
৮। শিক্ষকের ত্রুটিযুক্ত বানানসহ পাঠদান পদ্ধতি।	৮। শিক্ষকের ত্রট্টটিমুক্ত পাঠদান পদ্ধতি।
৯। আঞ্চলিকতার প্রভাব।	৯। আঞ্চলিকতামুক্ত শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠদান ও পাঠাভ্যাস।
১০। অভিধান ব্যবহারে অনীহা ও অজ্ঞতা।	১০। অভিধান ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

মূল্যায়নঃ

১. শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

২. বাংলা বানান ভুলের প্রধান কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে লিখুন।

৩. বাংলা বানান ভুলের প্রকৃতি বর্ণনা করুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ২**

প্রমিত বানানরীতি অনুসরণ, চর্চা ও অনুশীলন

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আপনারা জানেন, বাংলা ভাষার শব্দভান্ডার গড়ে উঠেছে বিবিধ উৎস থেকে শব্দসমূহকে নিয়ে। এতে আছে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ, আরবি, ফারসি, ইংরেজি শব্দ-- সর্বোপরি দেশি শব্দ। এগুলোর বানানরীতিও ভিন্ন ভিন্ন। বাংলা বানান প্রমিতকরণের সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে। বাংলাদেশ পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমীও ঐ নীতিমালাকে ভিত্তি করে বাংলা বানানরীতি প্রণয়ন করে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- বাংলা একাডেমীর বানান রীতির প্রধান প্রধান নিয়মসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নির্ভুল বানানসমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- বানান ত্রুটি দূরীকরণের উপায় সম্পর্কে বলতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বানানরীতি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বানানরীতি উপস্থাপন ও আলোচনা (পাঠ্য বইয়ের বানান- সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড- এর পুস্তকটি ব্যবহার করা য়ায়।)

নিচে প্রধান কয়েকটি নিয়ম দেখানো হল:

১। রেফ (র্) : তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি সব ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে 'রেফ' - এর পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হবে না। যেমন- পর্ব, কর্ম, অর্চনা, মূর্ছা, শর্ত, সূর্য, কার্য প্রভৃতি।

২। ক, খ, গ, ঘ, পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে 'ং' লেখা যাবে। যেমন- অহংকার, সংগীত, হৃদয়ংগম। বিকল্পে 'ঙ' লেখা যাবে। অন্যত্র ক, খ, গ, ঘ এবং ক্ষ-এর পূর্বে যুক্ত করার জন্য সর্বত্র 'ঙ' লেখা হবে। যেমন- অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে।

৩। হস্ চিহ্ন শব্দের শেষে থাকলে তা বর্জন করতে হবে। যেমন: চেক, ডিম, মক্তব, পট, ওস্তাদ, পিন প্রভৃতি। কিন্তু আরবি, ফারসি, হিন্দি বা বিদেশি ভাষার শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধতার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যাবে। যেমন- আল্লাহ্ , বাদশাহ্ , তখত্।

৪। জাতি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দ শেষে 'ি' - কার হবে। যেমন- ফরাসি, আরবি, সোমালি।

৫। স্ত্রী লিঙ্গে, চাচী, নানী, বাঘিনী, হরিণী প্রভৃতি শব্দ শেষে 'ী'-কার হবে। এক্ষেত্রে কতগুলো বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন -দিদি, বিবি, কবি, ঝি, চলিত, মিহি, চিনি প্রভৃতি শব্দ শেষে 'ি - কার হবে।

৬। সন্ধিজাত শব্দে 'ঙ' স্থলে 'ম' -এর জন্য 'ং' হবে। যেমন - সংগীত, (সম্ + গীত), সংঘাত (সম্ + ঘাত), অহংকার (অহম + কার); কিন্তু পূর্বপদ শেষে 'ম' - না থাকায় গংগা, অংক, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বানান শুদ্ধ নয়।

৭। তৎসম শব্দের শেষে/পূর্বে 'ী ' - কার ও 'ঊ' - কার হবে। যেমন- পক্ষী, কুম্ভীর, ঊনবিংশ, পূর্ব প্রভৃতি।

৮। অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজনে হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হয়। যেমন- কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম), তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ), নিচ (নিম্ন), নীচ (হীন)।

৯। সংস্কৃত তৎসম শব্দের বানানে এবং ঋ ধ্বনি শেষে শ, ষ শেষে সর্বত্র ণ লিখতে হবে। যেমন-কৃষাণ, কর্ষণ।

১০। শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে। যেমন- সাধারণত, মূলত (সাধারণতঃ বা মূলতঃ নয়)।

১১। শব্দের মধ্যে বিসর্গ বজায় থাকবে যেমন- অন্তঃপুর, অধঃপতন। বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে বানান নির্ধারিত হবে। যেমন - মনঃ+যোগ= মনোযোগ, যশঃ+লাভ = যশোলাভ ইত্যাদি।

১২। ও-কার উর্ধ-কমা, উচ্চারণ বা অর্থের পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা যাবে না। যেমন - ভাল, কাল, মত, পড় প্রভৃতি শব্দে ও-কার যুক্ত হবে না। করিয়া-করে, খাইয়া-খেয়ে এভাবে ক্রিয়াপদ সঙ্কুচিত করে প্রমিত চলিত রীতিতে উর্ধ কমা (') ব্যবহৃত হবে না।

১৩। বিদেশি শব্দ উচ্চারণে S স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে। যেমন: Post পোস্ট, Short শর্ট, Industry ইন্ড্রাস্ট্রি, Station স্টেশন প্রভৃতি।

পর্ব-খ : নির্ভুল বানানসমূহ চিহ্নিতকরণ

(ক) উচ্চারণ ঘটিত ত্রুটি জনিত শব্দের শুদ্ধ রূপ :

	শুদ্ধ
ই-ঈ	শারীরিক, ঈর্ষা
উ-ঊ	কৌতূহল, মুহূর্ত
ন - ণ	পূর্বাহ্ন, প্রাঙ্গণ
শ-র্ষ-স	শস্য, পরিষ্কার
য-ফলা (্য)	ব্যয়, দারিদ্র্য,সত্তা
ত-থ	মুখস্থ, অভাবগ্রস্ত
ট-ঠ	বৈশিষ্ট্য, যথেষ্ট
ত-ৎ	উচিত, হঠাৎ
ঁ	কাঁচা, পাপড়ি
র-ড়	নদীর ওপার, শাড়ীর পাড়
ঙ-ঙ্গ	বাঙালি, ভঙ্গুর

(খ) সন্ধি ঘটিত শব্দের শুদ্ধ রূপ :

শুদ্ধ	**অশুদ্ধ**
দুরবস্থা, নীরব, বয়ঃসন্ধি	দুরাবস্থা, নিরব, বয়সন্ধি

(গ) সমাস ঘটিত শব্দের শুদ্ধ রূপ

শুদ্ধ	**অশুদ্ধ**
নিরপরাধ, দিবারাত্র, অহোরাত্র	নিরপরাধী, দিবারাত্রী, অহরাত্রী

(ঘ) প্রত্যয় ঘটিত শব্দের শুদ্ধ রূপ

শুদ্ধ
দারিদ্র্য, সৌজন্য, প্রভৃতি

পর্ব-গ : বানান ভুলের প্রতিকার

- প্রাথমিক স্তর থেকে বানান ভিত মজবুত করা।
- মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।
- প্রাথমিক স্তর থেকেই সহানুভূতি ও ধৈর্যের সঙ্গে বানান শুদ্ধ করে লেখার চর্চা করানো।
- শুদ্ধ ব্যাকরণজ্ঞানসহ বানান শেখানো।
- শিক্ষাজীবনের শুরুতেই শুদ্ধ বানান শেখা ও শেখার গুরুত্ব প্রদান করা।
- বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে পাঠদান।
- পাঠ্যপুস্তকে মুদ্রিত বানান শুদ্ধতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা।
- শিক্ষকের ত্রুটিমুক্ত পাঠদান পদ্ধতি।
- আঞ্চলিকতামুক্ত শুদ্ধ উচ্চারণে পাঠদান ও পাঠাভ্যাস।
- অভিধান ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ২**

মূল শিখনীয় বিষয়
প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ, চর্চা ও অনুশীলন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং বাংলা একাডেমী প্রণীত প্রমিত বানান রীতি উপস্থাপন ও আলোচনা (পাঠ্য বইয়ের বানান- সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-এর পুস্তকটি ব্যবহার করা যায়।)

প্রধান কয়েকটি নিয়ম এই রকম :

১। রেফ (র্) : তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি সব ধরনের শব্দের ক্ষেত্রে 'রেফ' - এর পর ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হবে না। যেমন - পর্ব, কর্ম, অর্চনা, মূর্ছা, শর্ত, সূর্য, কার্য প্রভৃতি।

২। ক, খ, গ, ঘ, পরে থাকলে পদের অন্তস্থত 'ম' স্থানে 'ং' লেখা যাবে। যেমন- অহংকার, সংগীত, হৃদয়ংগম। বিকল্পে 'ঙ' লেখা যাবে। অন্যত্র ক, খ, গ, ঘ এবং ক্ষ-এর পূর্বে যুক্ত করার জন্য সর্বত্র 'ঙ' লেখা হবে। যেমন- অঙ্ক, আকাঙ্ক্ষা, সঙ্গে।

৩। হস্ চিহ্ন শব্দের শেষে থাকলে তা বর্জন করতে হবে। যেমন: চেক, ডিম, মক্তব, পট, ওস্তাদ, পিন প্রভৃতি। কিন্তু আরবি, ফারসি, হিন্দি বা বিদেশি ভাষার শব্দের উচ্চারণ শুদ্ধতার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা যাবে। যেমন- আল্লাহ্ , বাদশাহ্ , তখত্।

৪। জাতি, ভাষা ও বিশেষণবাচক শব্দ শেষে 'ি' - কার হবে। যেমন- ফরাসি, আরবি, সোমালি।

৫। স্ত্রী লিঙ্গে, চাচী, নানী, বাঘিনী, হরিণী প্রভৃতি শব্দ শেষে 'ী '-কার হবে। এক্ষেত্রে কতগুলো বিশেষ শব্দের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন -দিদি, বিবি, কবি, ঝি, চলিত, মিহি, চিনি প্রভৃতি শব্দ শেষে 'ি' - কার হবে।

৬। সন্ধিজাত শব্দে 'ঙ' স্থলে 'ম' -এর জন্য 'ং' হবে। যেমন - সংগীত, (সম্ + গীত), সংঘাত (সম্ + ঘাত), অহংকার (অহম + কার) কিন্তু পূর্বপদ শেষে 'ম' - না থাকায় গংগা, অংক, আকাংক্ষা প্রভৃতি বানান শুদ্ধ নয়।

৭। তৎসম শব্দের শেষে/পূর্বে 'ী' - কার ও 'ঊ' - কার হবে। যেমন- পক্ষী, কুম্ভীর, ঊনবিংশ, পূর্ব প্রভৃতি।

৮। অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজনে হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হবে। যেমন- কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম), নিচ (নিম্ন), নীচ (হীন)।

৯। সংস্কৃত তৎসম শব্দের বানানে এবং ঋ ধ্বনি শেষে শ, ষ শেষে সর্বত্র ণ লিখতে হবে। যেমন-কৃষাণ, কর্ষণ।

১০। শব্দের শেষে বিসর্গ বর্জিত হবে। যেমন- সাধারণত, মূলত (সাধারণতঃ বা মূলতঃ নয়)।

১১। শব্দের মধ্যে বিসর্গ বজায় থাকবে যেমন- অন্তঃপুর, অধঃপতন। বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে বানান নির্ধারিত হবে। যেমন - মনঃ+যোগ= মনোযোগ, যশঃ+লাভ = যশোলাভ ইত্যাদি।

১২। ও-কার উর্ধ-কমা, উচ্চারণ বা অর্থের পার্থক্য বোঝাতে ব্যবহার করা যাবেনা। যেমন - ভাল, কাল, মত, পড় প্রভৃতি শব্দে ও-কার যুক্ত হবে না। করিয়া-করে, খাইয়া - খেয়ে এভাবে ক্রিয়াপদ সঙ্কুচিত করে প্রমিত চলিত রীতিতে উর্ধ কমা (') ব্যবহৃত হবে না।

১৩। বিদেশি শব্দ উচ্চারণে S স্থানে স এবং sh স্থানে শ হবে। যেমন - Post পোস্ট, Short শর্ট, Industry ইন্ড্রাস্ট্রি, Station স্টেশন প্রভৃতি।

১৪। বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে 'ই'- কার হবে। যেমন - চৈতালি, সোনালি, বর্ণালি, মিতালি, রুপালি।

১৫। পদাশ্রিত নির্দেশক 'টি'- তে 'ই'-কার হবে। যেমন - মেয়েটি, লোকটি।

১৬। 'ক্ষ'-বিশিষ্ট সকল তৎসম শব্দে 'ক্ষ' অক্ষুণ্ন থাকবে। যেমন– অক্ষয়, ক্ষীর, ক্ষুধা, ক্ষুর, ক্ষেত্র, পক্ষ।

১৭। যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ করার জন্য প্রথম বর্ণের রূপ যথাসম্ভব ক্ষুদ্রাকারে এবং দ্বিতীয় বর্ণের রূপ পূর্ণরূপে লিখিত হবে। যেমন- অঙ্ক, শঙ্খ, সঙ্গে, স্পষ্ট।

১৮। সমাসবদ্ধ পদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন- আমন্ত্রণলিপি, জটিলতামূলক, বারবার, বিজ্ঞানসম্মত, সংবাদপত্র। অর্থগতভাবে একক হলেও তা একসঙ্গে লেখা হবে। যেমন- দৃঢ়সংকল্প, পিতাপুত্র, ষোলকলা।

১৯। বিশেষণবাচক পদ (গুণ, সংখ্যা বা দূরত্ব ইত্যাদি বাচক) হলে সেটি আলাদা বসবে। যেমন- এক জন, কত দূরে, সুন্দর ছেলে, ভালো দিন। কিন্তু কোন সমাসবদ্ধ পদ যদি অন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের গুণ বর্ণনা করে, তাহলে স্বভাবতই সেই যুক্তপদ একসঙ্গে লিখতে হবে। যেমন- একজন কবি, একদিন দেখা হবে, কতদূর নিয়ে যাবে, বেশিরভাগ মানুষ।

২০। নঞর্থক শব্দ পৃথকভাবে বসবে। যেমন- আসে নি, সহে না, হয় না।

২১। হযরত মুহাম্মদ (স)– এর নামের সঙ্গে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে (স), অন্য কোন নবী ও রাসুলের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (আ), সাহাবিদের নামের পরে (রা) এবং বিশিষ্ট মুসলিম ধার্মিক ব্যক্তির নামের পরে (র) লিখতে হবে।

২২। লেখক ও কবি নিজেদের নামের বানান যেভাবে লেখেন বা লিখতেন, সেভাবেই লেখা হবে।

২৩। বাংলাদেশের টাকার প্রতীকচিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য বইতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বইতে তার মূল্যনির্দেশক সংখ্যার পূর্বে টাকার চিহ্ন '৳' ব্যবহার করা হবে।

২৪। উপর্যুক্ত নিয়মাবলির বহির্ভূত শব্দের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অভিধানসমূহে প্রদত্ত প্রথম বানানটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

১। বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান: ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী
২। বাংলা একাডেমী বাংলা বানান অভিধান : জামিল চৌধুরী
৩। চলন্তিকা : রাজশেখর বসু।

মূল্যায়নঃ

১. বাংলা বানানের প্রধান ৫টি নিয়ম বর্ণনা করুন।
২. বানান ভুলের প্রতিকার সম্পর্কে লিখুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৩**

বানান শিক্ষণ পদ্ধতি

বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা, এভাষা শত শত বছর ধরে বহু মানুষের বহু ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে নিজস্ব ভাষারূপে আত্মস্থ করেছে। এ ভাষার রয়েছে নিজস্ব উচ্চারণ, বানান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এ ভাষার বর্ণ, বর্ণের প্রতিরূপ ও যুক্তবর্ণসহ বানানরীতিতে রয়েছে স্বকীয়তা। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের এ ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বলন, উচ্চারণ ও লিখনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি–

- বানান শিক্ষণের উপায় বলতে পারবেন।
- যুক্তাক্ষর চিহ্নিত করে তার বানান রীতি বিশ্লেষণ ও ত্রুটি সংশোধন করতে পারবেন।
- বানান শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : বানান শিখনের উপায়

দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক অভিভাবকের অসচেতনতা, অনুকূল পরিবেশ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধার অভাব প্রভৃতি কারণে শুদ্ধ উচ্চারণ, বানানে ত্রুটি ইত্যাদি ধরা পড়ে। তাই শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করে উচ্চারণ ও বানানরীতি ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ করে অনুশীলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বর্ণের বিন্যাসে গঠিত শব্দগুলোকে ভেঙ্গে, রেখাবিন্যাস ব্যাখ্যা করে, বর্ণক্রম পদ্ধতি থেকে শব্দক্রম পদ্ধতিতে বানান শিক্ষাদানে তৎপর হতে হবে। শব্দক্রমপদ্ধতির বড় সুবিধা হলো বর্ণক্রম পদ্ধতির অর্থহীন নিরানন্দময় অনুশীলন থেকে তা আনন্দদায়ক, আগ্রহ ও উৎসাহভিত্তিক অনুশীলন। শব্দক্রম পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতিরূপে পরিচিত। এ রীতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তর থেকেই পরিচিত ও প্রিয় শব্দগুলো বাছাই করে তা থেকে বর্ণ আলাদা করে বর্ণজ্ঞান স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে প্রদান করা হয়। যেমন- প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বানান শেখাবার সূচনা লগ্নে তাদের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত ‘মা’ শব্দটি ভেঙে (ম+আ=মা), বাবা = (ব+আ+ব+আ=বাবা) ইত্যাদি।

শব্দক্রম পদ্ধতি অনুশীলনে শিক্ষকের ধৈর্য ও সময় বেশি দিতে হবে। সহনশীলতার সঙ্গে প্রতিটি শিশুকে উচ্চারণ ও বানান অনুশীলন করাতে হবে। এভাবে তারা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য অনুধাবন করে বানান শুদ্ধ করতে পারবে। তবেই তারা শুদ্ধভাবে বলে এবং লিখে মাতৃভাষা চর্চায় দক্ষ হয়ে উঠবে। এজন্য প্রথমেই তাদের পরিচিত সহজ শব্দ ভান্ডার থেকে অযুগ্ম শব্দ নির্বাচন করে অর্থপার্থক্য চিহ্নিত করে বানান লেখা শুরু করতে হবে।

শুদ্ধ বানান শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস

বানান = ব+আ+ন+আ+ন (অর্থ=শব্দের বর্ণ বিন্যাস রীতি) বোন= ব+ও+ন (অর্থ=ভগিনী)। বন=ব+অ+ন (অর্থ=জঙ্গল)। ভাসা=ভ+আ+স+আ। ভাষা=ভ+আ+ষা+(অর্থ অভিব্যক্তি প্রকাশের বাচনিক ও লৈখিক রূপ)। বিশেষ=ব+ই+শ+এ+ষ (অর্থ=নির্দিষ্ট)। শিকড়=শ+ই+ক+ড় (অর্থ=গাছের মূল)।	দিন=দ+ই+ন=দিবস। দীন= দ+ঈ+ন=দরিদ্র। শেল=শ+এ+ল (অর্থ=কাঁটা, তীর নিক্ষিপ্ত শলাকা। কারণ=ক+আ+র+ণ (প্রচলিত-ন)। ধ্বনি= ধ+অ+ন+ই, অর্থ-আওয়াজ। ধনী= ধ+অ+ণ+ঈ=ধনবান। স+অ+ব=সকল ইত্যাদি।

পর্ব-খ : যুক্তাক্ষর চিহ্নিত করে তার বানানরীতি বিশ্লেষণ ও ত্রুটিসংশোধন

যুক্তাবর্ণ সংবলিত শব্দাবলি

বর্ণ, স্বর্ণ, অমৃত, আবৃত্তি, সম্মান, যুক্তাক্ষর, সাদৃশ্য উচ্চারণ, আঞ্চলিকতা, অঞ্চল, সমস্যা, ব্ল্যাকবোর্ড, পত্র ভিত্তি, ভিত্তিক, ভক্তি, বাক্য, সৃষ্টি, শক্তি, শব্দ ইত্যাদি। যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দের রেখা-বিন্যাস ব্যাখ্যার উদাহরণঃ

১। বর্ণ=ব+র+ণ (র বর্ণটি+ণ এর উপর বিশেষ ভঙ্গিমায় রেফ রূপে বিন্যস্ত)।

২। ভক্তি=ভ+ক+ত+ই (ক এবং ত বর্ণ দুটি যুক্ত ব্যঞ্জনে নতুন রূপে বিন্যস্ত)।

৩। অঞ্চল= অ+ঞ+চ+ল(ঞ এবং চ বর্ণ দুটি যুক্ত হয়ে নতুন আকৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে যুক্ত বর্ণ রূপ পেয়েছে)।

৪। আবৃত্তি= আ+ব+ঋ+ত+ই (ব এর সঙ্গে ঋ বর্ণ টি একটি ভিন্ন প্রতীকে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ত+ত হয়ে বর্ণ দুটির আকৃতির ভিন্নতা পেয়েছে উচ্চারণেও তা রক্ষিত হয়েছে)।

উচ্চারণ= উ+চ+চ+আ+র+ণ (দুটো চ একত্রে যুক্ত হয়েছে এবং উচ্চারণেও রক্ষিত হয়েছে।

দ্রুত= দ+র+উ+ত (দ বর্ণের পর র বর্ণের প্রতিরূপ+্র -উ কার প্রচলিত উ-কার না হয়ে ভিন্ন আকৃতি ও ভিন্ন মানে যুক্ত হয়েছে।

পর্ব-গ : বানান শিক্ষাদান পদ্ধতি

১। সহজ থেকে কঠিন

জানা ও পরিচিত সহজ শব্দ নির্বাচন করে বানান শিক্ষা দিতে হবে। ধীরে ধীরে কঠিনে যাবেন। এতে শিক্ষার্থীদের বানান অনুশীলন কঠিন ও ভারবহ না হয়ে খেলাভিত্তিক ও আনন্দদায়ক অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলে শিখনটিও স্থায়ী হবে।

২। বর্ণানুক্রম পদ্ধতির পরিবর্তে শব্দানুক্রম পদ্ধতি অনুসরণ

যেমন- বল (ব+অ+অ+ল=বল, খেলনা) হসন্ত রক্ষিত হবে না 'ল' এর পর 'অ' বর্ণের উচ্চারণ হবেনা। বল (ব+অ+ল+অ= বল, কথাবলা এখানেও লিখায় হসন্ত রক্ষিত হবে না এবং ল-বর্ণে অ উচ্চারণে রক্ষিত হবে ও অর্থ প্রকাশ যথার্থ হবে)।

৩। দেখা-শোনা-বলা-পড়া-লেখা পদ্ধতি অনুসরণ

কোন বস্তু বা বিষয় সম্বলিত নামটি নির্বাচন করে তা দেখিয়ে (বই, বল, ফল, ফুল, ছবি, মডেল, পাতা প্রভৃতি) তার স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, শুনিয়ে বোর্ডে লিখে দেবেন। এতে শিশুমনে বস্তুর সঙ্গে শব্দের সামঞ্জস্যমূলক পরিচয়ের ফলে, স্পষ্ট ধারণা ও বানান সহজ হয়, সময় ও শ্রম বাঁচে, অনুশীলনটিও আনন্দদায়ক হয়।

৪। শব্দ নির্বাচন

আনন্দদায়ক অধ্যায়/বই নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের তা থেকে শব্দ নির্বাচন করতে দিয়ে বানান অনুশীলন করানো।

৫। শুদ্ধভাবে লিখন অনুশীলন

শুদ্ধভাবে বর্ণ লিখন, যুক্তাক্ষর লিখন, বর্ণের প্রতিক দ্যোতক চিহ্নসমূহ শিক্ষার্থীদের চিনিয়ে অনুশীলন করাতে হবে।

৬। উপকরণ ব্যবহার

বানান শিক্ষাদান ও অনুশীলন করাতে যথাযথ (জীবন্ত, মডেল বা ছবি এঁকে) শব্দটি শিক্ষার্থীদের রঙিন চক/কালি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ করে তার শুদ্ধ রূপ তুলে ধরে স্থায়ী শিখন-সহায়তা দিতে হবে।

৭। ছাপার অক্ষর

সুন্দর হাতের লেখা এবং ছাপার অক্ষর শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শব্দ চার্ট বানিয়ে এবং ছাপা বই অনুসরণে মুদ্রণ প্রমাদযুক্ত শব্দ বাছাই করে শুদ্ধ রূপে লিখে তা তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথায় ছাপার অক্ষর প্রমাদ তাদের মনে শিক্ষক অভিভাবকের অগোচরে স্থায়ী হয়ে যাবে।

৮। পোস্টার, দেয়াল লিখন, সাইন বোর্ডের ভুল বানান সম্পর্কে সচেতনতা

শ্রেণীকক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা প্রদান করা এবং এগুলোর বানানরূপ চর্চা করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৯। যুক্তাবর্ণের রেখা বিন্যাস

এ বিষয়টি বানান শুদ্ধ করে চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে যুগ্ন ধ্বনিগুলোর মৌখিক ও লৈখিক অনুশীলন করতে হবে। যুগ্ম ধ্বনি রেখা বিন্যাস ব্যাখ্যা করে অনুশীলন ও উচ্চারণে শুদ্ধতা আনতে হবে।

১০। লিখন অনুশীলন

বর্ণগুলো সঠিকভাবে লিখনের অনুশীলন করাতে হবে। ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য ও লিখিত চিহ্ন হল বর্ণ। তাই এটি শুদ্ধভাবে লিখতে না শিখলে বানান শুদ্ধ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের স্তর, বয়স ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ রেখে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে শিক্ষককে সহানুভূতি ও ধৈর্য সহকারে লিখন অনুশীলন করিয়ে বানান শুদ্ধ করে লেখার চর্চা করতে হবে।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

বানান শিক্ষণ পদ্ধতি

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা একটি সমৃদ্ধ ভাষা। এভাষা শত শত বছর ধরে বহু ভাষাভাষী মানুষের ভাষা থেকে শব্দ আহরণ করে নিজস্ব ভাষা রূপে তা আত্মস্থ করেছে। এ ভাষার রয়েছে নিজস্ব উচ্চারণ, বানান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। এ ভাষার বর্ণ, বর্ণের প্রতিরূপ ও যুক্তবর্ণসহ বানান রীতিতে রয়েছে স্বকীয়তা। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীদের এ ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বলন, উচ্চারণ ও লিখনে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শিক্ষক অভিভাবকের অসচেতনতা, অনুকূল পরিবেশ, মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধার অভাব প্রভৃতি কারণে শুদ্ধ উচ্চারণ, বানানে ত্রুটি ইত্যাদি ধরা পড়ে। তাই শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে সচেতন করে উচ্চারণ ও বানান রীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে অনুশীলনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিভিন্ন বর্ণের বিন্যাসে গঠিত শব্দগুলোকে ভেঙ্গে, রেখা বিন্যাস ব্যাখ্যা করে, বর্ণক্রম পদ্ধতি থেকে শব্দক্রম পদ্ধতিতে বানান শিক্ষাদানে তৎপর হতে হবে। শব্দক্রমপদ্ধতির বড় সুবিধা বর্ণক্রম পদ্ধতির অর্থহীন নিরানন্দময় অনুশীলন থেকে আনন্দদায়ক, আগ্রহ ও উৎসাহভিত্তিক অনুশীলন। শব্দক্রম পদ্ধতি মনস্তাত্ত্বিক ও বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতি রূপে পরিচিত। এ রীতিতে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্তর থেকেই পরিচিত ও প্রিয় শব্দগুলো বাছাই করে তা থেকে বর্ণ আলাদা করে বর্ণ জ্ঞান স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে প্রদান করা হয়।

যেমন- প্রাথমিক স্তরের শিশুদের বানান শেখাবার সূচনা লগ্নে তাদের অত্যন্ত প্রিয় ও পরিচিত ‘মা’ শব্দটি ভেঙ্গে (ম+আ=মা), বাবা = (ব+আ+ব+আ=বাবা) ইত্যাদি।

শব্দক্রম পদ্ধতি অনুশীলনে শিক্ষকের ধৈর্য ও সময় বেশি দিতে হবে। সহনশীলতার সঙ্গে প্রতিটি শিশুকে উচ্চারণ ও বানান অনুশীলন করাতে হবে। এভাবে তারা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের পার্থক্য অনুধাবন করে বানান শুদ্ধ করতে পারবে। তবেই তারা শুদ্ধভাবে বলে এবং লিখে মাতৃভাষা চর্চায় দক্ষ হয়ে উঠবে। এজন্য প্রথমেই তাদের পরিচিত সহজ শব্দ ভান্ডার থেকে অযুগ্ম শব্দ নির্বাচন করে অর্থপার্থক্য চিহ্নিত করে বানান লেখা শুরু করতে হবে।

শুদ্ধ বানান শুদ্ধ বর্ণ বিন্যাস রীতি	
বানান = ব+আ+ন+আ+ন (অর্থ=শব্দের বর্ণ বিন্যাস রীতি) বোন= ব+ও+ন (অর্থ=ভগিনী)। বন=ব+অ+ন (অর্থ=জঙ্গল)। ভাসা=ভ+আ+স+আ। ভাষা=ভ+আ+ষা+(অর্থ অভিব্যক্তি প্রকাশের বাচনিক ও লৈখিক রূপ)। বিশেষ=ব+ই+শ+এ+ষ (অর্থ=নির্দিষ্ট)। শিকড়=শ+ই+ক+ড় (অর্থ=গাছের মূল)।	দিন=দ+ই+ন=দিবস। দীন= দ+ঈ+ন=দরিদ্র। শেল=শ+এ+ল (অর্থ=কাঁটা, তীর নিক্ষিপ্ত শলাকা। কারণ=ক+আ+র+ণ (প্রচলিত-ন)। ধ্বনি= ধ+অ+ন+ই, অর্থ-আওয়াজ। ধনী= ধ+অ+ণ+ঈ=ধনবান। স+অ+ব=সকল ইত্যাদি।

বানান শিক্ষাদান পদ্ধতি ও কৌশল

ক) সহজ থেকে কঠিন

জানা ও পরিচিত সহজ শব্দ নির্বাচন করে বানান শিক্ষা দিতে হবে। ধীরে ধীরে কঠিনে যাবেন।

খ) বর্ণক্রম পদ্ধতির পরিবর্তে শব্দক্রম পদ্ধতি অনুসরণ

যেমন- বল (ব+অ+অ+ল= বল, খেলনা) হসন্ত রক্ষিত হবে না 'ল' এর পর 'অ' বর্ণের উচ্চারণ হবে না। বল (ব+অ+ল+অ= বল, কথাবলা এখানেও লিখায় হসন্ত রক্ষিত হবে না এবং ল-বর্ণে অ উচ্চারণে রক্ষিত হবে ও অর্থ প্রকাশ যথার্থ হবে)।

গ) দেখা-শোনা-বলা-পড়া-লেখা পদ্ধতি অনুসরণ

কোন বস্তু বা বিষয় সম্বলিত নামটি নির্বাচন করে তা দেখিয়ে (বই, বল, ফল, ফুল, ছবি, মডেল, পাতা প্রভৃতি) তার স্পষ্ট উচ্চারণে বলে, শুনিয়ে বোর্ডে লিখে দেবেন।

ঘ) শব্দ নির্বাচন

আনন্দদায়ক অধ্যায় / বই নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের তা থেকে শব্দ নির্বাচন করতে দিয়ে বানান অনুশীলন করানো।

ঙ) শুদ্ধভাবে লিখন অনুশীলন

শুদ্ধভাবে বর্ণ লিখন, যুক্তাক্ষর লিখন, বর্ণের প্রতীকদ্যোতক চিহ্নসমূহ শিক্ষার্থীদের চিনিয়ে অনুশীলন করাতে হবে।

চ) উপকরণ ব্যবহার

বানান শিক্ষাদান ও অনুশীলন করাতে যথাযথ (জীবন্ত, মডেল বা ছবি এঁকে) শব্দটি শিক্ষার্থীদের রঙিন চক/কালি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ করে তার শুদ্ধ রূপ তুলে ধরে স্থায়ী শিখন-সহায়তা দিতে হবে।

ছ) ছাপার অক্ষর।

সুন্দর হাতের লেখা এবং ছাপার অক্ষর শিশুমনে প্রভাব বিস্তার করে। তাই শব্দ চার্ট বানিয়ে এবং ছাপা বই অনুসরণে মুদ্রণ প্রমাদযুক্ত শব্দ বাছাই করে শুদ্ধ রূপে লিখে তা তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করতে হবে।

জ) পোস্টার, দেয়াল লিখন, সাইনবোর্ডের ভুল বানান সম্পর্কে সচেতনতা ।

শ্রেণীকক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা প্রদান করা এবং এগুলোর বানানরূপ চর্চা করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

ঝ) যুক্তবর্ণের রেখা বিন্যাস

এ বিষয়টি বানান শুদ্ধ করে চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে যুগ্ন ধ্বনিগুলোর মৌখিক ও লৈখিক অনুশীলন করতে হবে। যুগ্ম ধ্বনি রেখা বিন্যাস ব্যাখ্যা করে অনুশীলন ও উচ্চারণে শুদ্ধতা আনতে হবে।

ঞ) লিখন অনুশীলন

বর্ণগুলো সঠিকভাবে লিখনের অনুশীলন করাতে হবে। ধ্বনির দৃষ্টিগ্রাহ্য ও লিখিত চিহ্ন হল বর্ণ। তাই এটি শুদ্ধভাবে লিখতে না শিখলে বানান শুদ্ধ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীদের স্তর, বয়স ও আগ্রহের প্রতি লক্ষ রেখে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে শিক্ষককে সহানুভূতি ও ধৈর্য সহকারে লিখন অনুশীলন করিয়ে বানান শুদ্ধ করে লেখার চর্চা করতে হবে।

মূল্যায়নঃ

১. বানান শিখনের উপায়সমূহ লিখুন।

২. বানান শিক্ষাদান পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৪**

বাংলা উচ্চারণ : উচ্চারণরীতি

যে কোনো ভাষার কথ্যরীতিতে ও ভাষার ব্যবহারে উচ্চারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। পৃথিবীর উন্নত ভাষাগুলোর উচ্চারণের মান নির্ধারিত থাকে উচ্চারণরীতি দ্বারা। সে ক্ষেত্রে উচ্চারণের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ রেখে শিক্ষার্থীকে সচেতন ও দক্ষ করে তোলা যায়। কিন্তু বাংলায় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এব্যাপারে সঠিক গুরুত্ব দেয়া হয় না বলে শিখনও পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নত মানের হয় না। এর বহুমাত্রিক কার্যকারণ রয়েছে। বাংলা উচ্চারণরীতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম শিক্ষকের থাকা চাই সুস্পষ্ট ধারণা এবং বাক্‌প্রশিক্ষণ।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- বানান ও উচ্চারণ পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- উচ্চারণে ত্রুটি ঘটতে পারে এরূপ শব্দ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- উচ্চারণরীতি ও বানানরীতি ব্যাখ্যা করে তা অনুশীলন করা ও করাতে পারবেন।
- শুদ্ধ উচ্চারণে বলতে, পড়তে ও শেখানোতে সচেষ্ট হতে পারবেন।
- শুদ্ধ উচ্চরণ অনুশীলন করে উচ্চারণ দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন।

পর্বসমূহ

পর্ব-কঃ মাতৃভাষা বাংলায় শুদ্ধ উচ্চারণরীতির প্রয়োজনীয়তা

মাতৃভাষা বাংলায় শুদ্ধ উচ্চারণ রীতির পার্থক্য রয়েছে, অর্থাৎ বাংলায় বহু শব্দ বানান অনুযায়ী উচ্চারিত হয় না বা উচ্চারণ অনুযায়ী বানানও করা হয় না। পৃথিবীর কোনো ভাষাই যদিও পুরোপুরি বানান-উচ্চারণ সঙ্গতি রক্ষা করে চলে না, কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই বিসঙ্গতির বিষয়টি ভাষাচিন্তাবিদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করেন এবং বাংলায় ব্যবহৃত শব্দের প্রমিত উচ্চারণের নিয়ম সংকলনের উদ্যোগী হন।

বিদেশি বহু শাসক এদেশ শাসন করেছে; তাদের প্রয়োজন ও সুবিধার প্রতি নজর রেখে অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত সময়ে বাংলা উচ্চারণরীতিও প্রভাবিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে ভাষাতাত্ত্বিক তথা ধ্বনিবিজ্ঞানীরা বাংলা শব্দের উচ্চারণরীতি নির্দেশ করেছেন। এ রীতি অনুসরণে বাংলা ভাষায় উচ্চারণ ও বানানদক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। শুদ্ধ উচ্চারণ ছাড়া শুদ্ধভাবে ভাষা বলা, পড়া বা লেখা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এ দক্ষতাগুলো একটি অপরটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত।

এ বিষয়ে সচেতন থেকে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণরীতি শেখানো প্রয়োজন। শিক্ষকের সহানুভূতি, ধৈর্য ও আগ্রহ শিক্ষার্থীদের এক্ষেত্রে সফল করে তুলবে।

এখন নিজে ভেবে দেখুন : শুদ্ধ উচ্চারণের আর কোনো অতিমাত্রিক/অতিরেক প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে কিনা। নিচের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করতে পারেন।

- শুদ্ধ উচ্চারণে ভাষা ব্যবহার করতে পারলে নিজের ব্যক্তিক-প্রকাশে পরিশীলিত মনোভাব আসে
- বাক প্রকাশ ও পেশাগত উৎকর্ষ লাভ করা যায়
- বক্তৃতা-বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক এবং প্রদর্শনকলায় ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভ করা যায়
- ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী, আত্মীয়-স্বজন এবং জনসমক্ষে 'সুভাষিক-ব্যক্তিত্ব' হিসেবে সমাদৃত হওয়া যায়।

এই পর্বের গ্রাহ্য দিকগুলো কী-কী বলে মনে হয়?

পর্ব-খঃ উচ্চারণ সংক্রান্ত সমস্যা চিহ্নিতকরণ

জীবন্ত ভাষা হিসেবে বাংলার ধর্ম হচ্ছে 'গতি'। তাই প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু পরিবর্তন/রূপান্তর এতে ঘটছে, ঋদ্ধ হচ্ছে ভাষা। সঙ্গত কারণেই শুধু সূত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণভাবে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্বকে চিরস্থায়ী-বন্ধনে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ কিছু প্রমিত (standard) উচ্চারণ মানদণ্ড/প্রতিরূপ (norm) অবশ্যই মেনে চলা প্রয়োজন।

উচ্চারণ-সমস্যার স্বরূপঃ

বাংলা ভাষা যুগ যুগ ধরে বহু মানুষের বিভিন্ন ভাষা থেকে বহু শব্দ গ্রহণ করেছে। সেগুলোকে আমরা তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি হিসেবে জানি। কিন্তু বাচনিক ভাষায় সেগুলোর ব্যবহার সর্বত্র বাংলায় ধ্বনিক পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে না। আবার, বর্ণমালার গঠন অনুযায়ী উচ্চারণ, ভাষা প্রয়োগরীতি সংক্রান্ত উচ্চারণও আমাদের জন্য নানা সমস্যার সৃষ্টি করে।

বর্ণের লেখ্য রূপ ও উচ্চারণে ভিন্নতা

বিভিন্ন ই, ঈ, উ, ঊ, বর্ণগুলোর বানান শুদ্ধ করে লিখলেও বর্ণ-সম্পৃক্ত উচ্চারণে এগুলোর হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা রক্ষিত হয় না। এতে উচ্চারণের কারণে বানানে ভুল থেকে যায়। যেমন: দিন-দীন, ধ্বনি-ধনী প্রভৃতি।

যুক্তবর্ণ ঘটিত শব্দের উচ্চারণ

বাংলা ভাষায় একই ধরনের উচ্চারণ বিশিষ্ট যুক্তাক্ষরগুলোর গঠন ও আকৃতিগত বৈচিত্র্যের কারণে শিক্ষার্থীরা উচ্চারণ সমস্যায় এবং সে সঙ্গে বানান সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন: ছন্দ-দ্বন্দ্ব, সত্ত্ব (আমসত্ত্ব)- সত্ব (মালিকানা) প্রভৃতি। আকৃতিগত বৈচিত্র্যসম্পন্ন শব্দ: অরুন-অরুণ। শুক্র-শক্র-বক্র ইত্যাদি।

সমোচ্চারিত শব্দের বানান ও অর্থের ভিন্নতা

বাংলায় ব্যবহৃত শব্দভাণ্ডারে এমন অনেক সমোচ্চরিত শব্দ রয়েছে যেগুলোর উচ্চারণ একই ধরনের কিন্তু বানান রীতি ভিন্ন। যেমন: শব-সব, স্বীকার-শীকার, দ্বারা-দারা, আপণ-আপন, নীড়-নীর ইত্যাদি।

সাধু ভাষা রীতি ও চলিত ভাষা রীতির মিশ্রণ

ভাষার রীতি পরিবর্তন কালে কিছু শব্দ উচ্চারণ সৌকর্য লাভ করে, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ সঙ্কুচিত হয়ে ভিন্নতা যুক্ত হয়। যেমন- দুপর-দুপুর, রৌদ্র-রোদ-রোদ্দুর, পনর-পনের, সতর-সতের-সতেরো, কর-করো-কোরো, তাহার-তার, খাইয়া-খেয়ে, বেলা-বেলা (বেলাভূমি বোঝাতে) ইত্যাদি।

যুক্তবর্ণে রেখাবিন্যাস ঘটিত উচ্চারণ সমস্যা

যেমন - 'সম্মান' শব্দটি লিখতে গিয়ে সন্‌মান উচ্চারণ ও লেখার ত্রুটি ঘটে অনেকের।

উচ্চারণ আছে, বর্ণ নাই

বাংলায় অ বর্ণের উচ্চারণ বিভিন্নতা সমধিক। এটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাশের বর্ণ-ধ্বনির সঙ্গে সমীভূত হয় অথবা সৌকর্যের খাতিরেও 'অভিশ্রুতি' লাভ করে। যেমন : অতি → ও'তি, সময় → সোময়। আবার, 'এ' বর্ণটিও ক্ষেত্রে বিশেষে 'এ' বা 'এ্যা/অ্যা' উচ্চারিত হয়। যেমন : একটি, কিন্তু এ্যাকটা। অ এবং ও-র মাঝামাঝি অভিশ্রুত-ও' -এর জন্য এবং এ্যা/অ্যা হিসেবে আলাদা বর্ণ নাই।

আঞ্চলিকতাজনিত উচ্চারণসমস্যা

১। ভুল উচ্চারণ (আনুনাসিক নয়, এমন আনুনাসিক উচ্চারণ)
২। বর্ণবিচ্যুত উচ্চারণ ত্রুটি (ক-খ , প-ফ , ত-থ, ট-ঠ, ড-ঢ, র-ড়)
৩। শিক্ষকের আঞ্চলিক উচ্চারণ।

বিশেষ সমস্যা ও ত্রুটি

১। বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি
২। কঠিন শব্দ উচ্চারণ দিয়ে অনুশীলন সূচনা
৩। ভুল বানানে উচ্চারণ, অনুশীলন/শিক্ষকের বাগ্‌যন্ত্রজনিত ত্রুটির ফলে ত্রুটিযুক্ত উচ্চারণ।

একাগ্রতা, ধৈর্য ও মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগের অভাব

অমনোযোগী হয়ে শুনলে, দেখলে বা পড়লে উচ্চারণ সমস্যা হতে পারে। মনে রাখতে হবে বাংলা একটি জীবন্ত ভাষা। ব্যাকরণ, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব বাক-উচ্চারণ তত্ত্বের চিরস্থায়ী কোন রূপে একে আবদ্ধ করা যাবে না। এর প্রবহমান গ্রহণ বর্জন প্রক্রিয়ায় প্রমিত কথ্য রূপের বাচন ভঙ্গির উচ্চারণ রীতিকে অনুসরণ করেই বর্তমান প্রজন্মকে উচ্চারণ শুদ্ধতায় অভ্যস্ত করে তুলতে হবে।

উচ্চারণ সংক্রান্ত মৌলিক ধারণা :

শিক্ষককে শুরুতেই অনুধাবন করতে হবে যে, উচ্চারণ হচ্ছে আসলে এক ধরনের বাচনিক ক্রিয়া। উচ্চারণ তাই ধ্বনির শ্রবণগত প্রকাশ বা বাগ্‌ধ্বনির শ্রুতিগত অভিব্যক্তি। আর মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যেই সকল ধ্বনি উচ্চারণ করে। সাধারণত ফুসফুস থেকে আগত বাতাস দেহস্থিত বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত হয়ে (বাধা পেয়ে বা বাধা না পেয়ে) উচ্চারণ সম্ভব করে তোলে। তাই প্রথমেই বাগ্‌যন্ত্র এবং সেগুলোর সাধারণ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ক. বাগ্‌যন্ত্র :

প্রদত্ত চিত্রে সরলভাবে মানুষের প্রধান বাগ্‌যন্ত্রগুলো দেখানো হয়েছে:

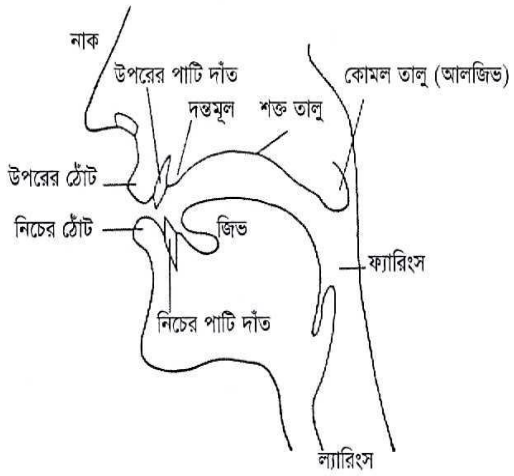

বাগ্‌যন্ত্রের চিত্র

চিত্র- : বাগ্‌যন্ত্র (সূত্র : ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা, মোঃ জীনাত ইমতিয়াজ আলী এবং ওপেন সোর্স)
প্রাথমিক হিসাবে বাগ্‌যন্ত্রের সংখ্যা ১৪টি, কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয় --
জিহক্ষা, স্বরযন্ত্র এবং ফুসফুসকে ।

খ. বায়ুপ্রবাহের কৌশল (Air stream mechanism) :

একে সহজভাবে উচ্চারণ কৌশলও বলা যেতে পারে। বাক্‌প্রত্যঙ্গের মধ্যে বায়ু কী ভাবে সঞ্চালিত হয়ে, কোন-কোন গতিপথে প্রবাহিত হয়ে, কেমন করে বিভিন্ন ধ্বনি উৎপন্ন হয়- এই সার্বিক বিষয়টিকে বাগধ্বনি বিচারের আধুনিকতম দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা হয়েছে বায়ু প্রবাহের কৌশল হিসেবে। এর প্রধান ৩টি ধরন : ১) ফুসফুসাগত ২) শ্বাসরন্ধ্রিক ৩) প্রশ্বাস। ফুসফুস থেকে বাতাস দিয়ে যেমন ধ্বনি উৎপন্ন হয় তেমনি শুধু মুখের ভেতরকার বাতাসকে আলোড়িত করে, এমন কি মুখের বাইরের বাতাসকে ভেতরে টেনে নিয়েও ধ্বনি উৎপাদন করা যায়। বাংলায় প্রায় সব ধ্বনিই ফুসফুসাগত।

গ. ধ্বনির প্রকার ভেদ :

মানব-ভাষা মাত্রেরই ধ্বনি সাধারণত ২ প্রকার- স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনি উচ্চারণে বাতাস কোথাও বাধা পায় না, স্বরযন্ত্র বেশি কাঁপে এবং ধ্বনি অন্য ধ্বনির সাহয্য ছাড়াই উচ্চারিত হয়। ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, বাগ্‌যন্ত্রের কোথাও বাধা প্রাপ্ত হয় বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপ খায় এবং ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করে। জিহবার উচ্চতা এবং আরো ২/১টি বিচারে স্বরধ্বনিকে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ হলো : ব্যঞ্জনধ্বনির ভাগ। প্রধানত উচ্চারণের রীতির বিচারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে যথাক্রমে ৭ এবং ৮ ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে উচ্চারণ স্থানের গুরুত্ব একটু বেশি।

বাংলা বর্ণমালা অনুসারে ধ্বনিচিহ্ন

ধ্বনি	
স্পর্শ	প্ , ফ্ , ব্ , ভ্, ত্ , থ্ , দ্ , ধ্, চ্ , ছ, জ্, ঝ্ , ট্ , ঠ্, ড্, ঢ্
নাসিক্য	ঙ্ , ম্ , ন্
কম্পনজাত	র্
তাড়নজাত	ড়্, ঢ়্
ঘর্ষণজাত	স্ , শ্ , হ্
পার্শ্বিক	ল্
পার্শ্বিক নৈকট্যমূলক	অন্তস্থ ব্, অন্তস্থ য়

উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি।

<স্বরধ্বনির ছক >

	সম্মুখ	পশ্চাৎ
উচ্চ	ই i	উ u
মধ্য	এ e (ə)	ও o ও' ɒ অ ɔ
নিম্ন	এ্যা æ	আ a

উচ্চারণরীতি ↓		*উচ্চারণ স্থান*							
			ওষ্ঠ্য	**দন্ত্য**	**দন্ত-মূলীয়**	**তালব্য-দন্তমূলীয়**	**তালব্য**	**জিহ্বা-মূলীয়**	**কণ্ঠ-নালীয়**
স্পৃষ্ট	*অঘোষ*	**অল্পপ্রাণ**	প্	ত্		ট্	চ্	ক্	
		মহাপ্রাণ	ফ্	থ্		ঠ্	ছ্	খ্	
	ঘোষ	**অল্পপ্রাণ**	ব্	দ্		ড্	জ্	গ্	
		মহাপ্রাণ	ভ্	ধ্		ঢ্	ঝ্	ঘ্	
নাসিক্য			ম্		ন্			ঙ্	
রণিত					র্				
তাড়নজাত		**অল্পপ্রাণ**				ড়্			
		মহাপ্রাণ				ঢ়্			
পার্শ্বিক					ল্				
ঘর্ষণজাত/শিসজাত					স্		শ্		হ্

সাধারণভাবে বিন্যস্ত বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির ছক

উচ্চারণের স্থান → উচ্চারণের রীতি ↓	ওষ্ঠ্য/দ্বিওষ্ঠ্য **Bilabial**	দন্তৌষ্ঠ্য **Labio-dental**	দন্ত্য **Dental**	দন্তমূলীয় **Alveolar**	তালব্য–দন্ত্যমূলীয় **Plato-alveolar**	জিহবামূলীয় **Velar**	কণ্ঠ/ কণ্ঠনালীয় **Glottal**
স্পর্শ/স্পৃষ্ট **Stop/Plosive**	প্ p ফ্ p^h ব্ b ভ্ $b^ɦ$	ফ্ f (Ø^ɦ)	ত্ t̪ থ্ t̪^{h} দ্ d̪ ধ্ d̪^{ɦ}	ট t ঠ t^h ড d ঢ $d^ɦ$	চ c ছ c^h জ J ঝ Jh	ক k খ k^h গ g ঘ $g^ɦ$	
ঘর্ষণজাত **Fricative**	ব্ b			স্ s জ্’ z	শ š / ʃ	খ্ x গ্’ γ	হ্ h
নাসিক্য **Nasal**	ম্ m						
পার্শ্বিক **Lateral**				ন n	ঞ্ ɲ	ŋ	
কম্পনজাত **Trill**				ল l			
তাড়নজাত **Flap**				র্ r	ড় r̟	ঢ় r̟^{ɦ}	
Glide	ব্’ w				য়্ y		

উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণরীতি অনুযায়ী বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি

বায়ু প্রবাহের কৌশল, কোমল তালু ও স্বরতন্ত্রের অবস্থা অনুসারে ব্যঞ্জনধ্বনি চিহ্নিত হয়। তাছাড়া, কোমল তালুর অবস্থানুসারে ধ্বনিকে মৌখিক ও নাসিক্য বলা হয়। মৌখিক - কোমল তালু (আল জিহবা) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, বাতাস শুধু মুখ দিয়ে বের হয়। নাসিক্য - কোমল তালু নিচে ঝুলে যায়, বাতাস নাক বা নাক- মুখ দিয়ে বের হয়। স্বরতন্ত্রের অবস্থানুযায়ী ধ্বনি

ঘোষ ও অঘোষ হয়। অঘোষ - স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় না (বা খুবই কম কাঁপে), ঘোষ - স্বরতন্ত্রী কম্পিত হয় (স্বর ও ব্যঞ্জন উভয় প্রকার ধ্বনিতে)।

প্রদত্ত চিত্র নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করলে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান ও রীতি তথা বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। তাতে ধ্বনিগুলো সহজে ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে।

এই পর্বে উল্লিখিত বিষয়ের সঙ্গে উচ্চারণ-সমস্যা সংক্রান্ত আর কী-কী আলোচিত হতে পারে বলে আপনার মনে হয় ?

পর্ব-গ : লেখা ও প্রমিত উচ্চারণে অনুশীলন করা

একেবারে বিশুদ্ধ বা সঠিক উচ্চারণ কোনটি? এরকম প্রশ্ন করাই যেতে পারে। প্রশ্ন হতে পারে: প্রমিত উচ্চারণই বা কী? একটি ভাষা-ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকগুলো উপভাষা অথবা আঞ্চলিক ভাষা থাকতে পারে, কিন্তু এক একটি বিশেষ অঞ্চলের উপভাষাকে ভিত্তি করে সমগ্র ভাষা-গোষ্ঠীর যোগাযোগের বাহন বা মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়; দেশের সর্বত্রবোধ্য পরিশীলিত এই ভাষা-রূপকে বলে প্রমিত ভাষা (বা মান ভাষা, Standard Language), আর এ উচ্চারণই হচ্ছে প্রমিত উচ্চারণ।

রাষ্ট্রীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক পর্যায়ে, গণমাধ্যমে, শিক্ষায়/উচ্চশিক্ষায়, সভা-সমিতিতে, সুশীল নাগরিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, সুভদ্র পরিবেশে ও সমাজে ব্যবহৃত হয় প্রমিত ভাষা-রূপ।

প্রমিত উচ্চারণ শেখা প্রকৃত পক্ষে দীর্ঘ মেয়াদী ব্যাপক অনুশীলন সাপেক্ষ। তবে, বাংলার শিক্ষক এই মডিউল অনুসরণে যত্নবান ও একাগ্র হলে অনেকটাই কার্যকরভাবে প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করাতে সফল হতে পারেন।

মৌলিক কিছু বিষয় অনুধাবন অত্যাবশ্যক। বাংলায় সর্বমোট বর্ণচিহ্ন ৫০টি = স্বরবর্ণ ১১ + ব্যঞ্জন বর্ণ ৩৯। কিন্তু বর্ণমালায় যেভাবে ধ্বনির প্রতীক লিপিবদ্ধ হয় প্রকৃত উচ্চারণে তা হয় না। কারণ বাংলায় প্রকৃত মৌলিক ধ্বনি হচ্ছে ৮+৩০ = ৩৮টি। পৃথিবীর কোনো বর্ণমালাতেই না হলেও কৃত্রিম বর্ণমালা IPA (International Phonetic Alphabets বা আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা)-তে বর্ণ ও ধ্বনির মধ্যে ১:১ অনুপাত (অর্থাৎ এক বর্ণ = এক ধ্বনি) রক্ষিত হয়েছে।

এই IPA -এর দ্বারা অনেকাংশেই প্রমিত উচ্চারণ লেখা ও অনুশীলন করা যায়; কিন্তু এর জন্য অর্জিতব্য দক্ষতা দীর্ঘ প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন সাপেক্ষ।

আপাতত, বাংলা বর্ণমালারই সর্বাধিক সুবিধা ব্যবহার করে যথাসম্ভব প্রমিত উচ্চারণের সর্বাধিক নিকটবর্তী উচ্চারণ-বিশুদ্ধতার অনুশীলন করা যায়। এর নমুনা হিসেবে নিচের পর্বে প্রদত্ত 'উচ্চারণ রীতির' অনুশীলন করা যায়।

এ পর্যন্ত আপনার পর্যবেক্ষণ ও ভাবনা থেকে বলুন :

* প্রমিত উচ্চারণের ক্ষেত্রে শিক্ষনে আর কী-প্রকার ধারণা ব্যক্ত করা যায়?
* প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলনের জন্য আমাদের মডিউল ছাড়া আর কোনো সহায়তা কী পাওয়া যেতে পারে?
* জন্মগত আংশিক-বাক্‌প্রতিবন্ধীদের (যাদের বাগ্‌যন্ত্রে ত্রুটি থাকে) উচ্চারণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে?

পর্ব-ঘ : বাংলা উচ্চারণ রীতি অনুযায়ী অনুশীলন

এখানে বাংলা উচ্চারণ নিয়ে সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে যিনি সেই অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস প্রণীত এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ''বাংলা উচ্চারণ অভিধান" অনুসরণে কিছু বাংলা নমুনা শব্দের বানান-মাত্রিক কাঙ্ক্ষিত উচ্চারণ দেখানো হয়েছে -- বাংলা বর্ণমালার ধ্বনি পদ্ধতির সর্বাধিক সুবিধা গ্রহণ করে।

অনুশীলনে অন্তত একটি ধ্বনির ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে; তা হচ্ছে অভিশ্রুত-ও'। ধ্বনিটি 'অ' এবং 'ও'-র মাঝামাঝি উচ্চারিত <যেমন–''ঘরের কোনে বিয়ের ক'নে বসেছে"- বাক্যে প্রথমে 'ও' ব্যবহৃত হলেও পরে 'কনে' শব্দে অভিশ্রুত-ও' উচ্চারিত হচ্ছে>। এখানে অবশ্য অভিশ্রুত-ও' র জন্য পুরো 'ও'-র বিকল্প চিহ্ন [ো] ব্যবহৃত হয়েছে।

এছাড়া নাসিক্য বর্ণের/ধ্বনির প্রভাবে পার্শ্ববর্তী ধ্বনি 'সমীভূত/প্রভাবিত' হতে পারে; যেমন - ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ইত্যাদি যুক্ত শব্দে।

উচ্চারণ - অনুশীলন (বানানসহ)

বানান	উচ্চারণ
বৈশিষ্ট্য -	বোইশিশ্‌টো
গন্ধমৃগ -	গন্‌ধোমৃগো
শিক্ষণীয়-	শিক্‌খোনিয়ো
অবসান-	অবোসান্‌
স্বাচ্ছন্দ-	শাচ্‌ছন্‌দো
সংক্ষেপন-	শঙ্‌খেপন/পেন্‌
প্রশাসনিক-	প্রোশাশোনিক্‌
প্রশ্নোত্তর-	প্রোশ্‌নোত্‌তর্‌
চিরজীবী-	চিরোজিবি
বর্ণনা-	বর্‌ণনা/নোনা
সর্বস্ব-	শর্‌বোশ্‌শো
প্রজ্ঞা-	প্রোগ্‌গাঁ
স্নাত-	স্নাতো
স্বনামখ্যাত-	শনাম্‌খ্যাতো
ইঙ্গবঙ্গ-	ইঙ্‌গোবঙ্‌গো
কর্তৃকারক-	কোর্‌তৃকারোক্‌
আত্মসম্মান-	আত্‌তোঁশমান্‌
পুস্তক-	পুস্‌তক্‌
স্মৃতি-	সঁৃতি
সমন্বিত -	শমোন্‌নিতো
বদ্ধ-	বদ্‌ধো
পরিলক্ষিত-	পরিলোক্‌খিত

বানান	উচ্চারণ
মনোজ্ঞ-	মনোগ্‌গো
অগ্রপথিক-	অগ্‌গ্রোপথিক্‌
ইচ্ছুক-	ইচ্‌ছুক্‌
সন্দিগ্ধ-	শন্‌দিগ্‌ধো
স্থিরীকরণ-	স্থিরিকরোন্‌
গাঁথনী-	গাঁথোনি/গাঁথ্‌নি
বক্তৃতা-	বোক্‌তৃতা
মন্ত্রণালয়-	মন্‌ত্রোনালয়
বঙ্গ-	বঙ্‌গো
সংজ্ঞা-	শঙ্‌গাঁ
তীক্ষ্ণ-	তিখ্‌নো
মধ্যাহ্ন-	মোদ্‌ধান্‌হো
হরিণ-	হোরিন্‌
বিজ্ঞান-	বিগ্‌গ্যাঁন/বিগ্‌গাঁন
বাঁধন হারা -	বাঁধোন্‌হারা
গমনোন্মুখ-	গমোনোন্‌মুখ
তত্ত্বীয়-	তোত্‌তিয়ো
বর্মী-	বোর্‌মি
কর্ত্রী -	কোর্‌ত্রি
বক্তৃতা-	বোক্‌তৃতা
সম্মিলনী-	শম্‌মিলোনি
গম্ভীর-	গোম্‌ভীর
সমীক্ষণ-	শোমিক্‌খন্‌

আপনি খেয়াল করেছেন কি?

- কোন ধরনের বানানের শব্দ উচ্চারণে কোন ধরনের অসুবিধা হতে পারে?
- কী প্রকার কৌশল অবলম্বন করলে কঠিন উচ্চারণ মোটামুটি সহজ ভাবে আয়ত্ত করা যেতে পারে?
- কোন ধরনের বর্ণের ধ্বনি পার্শ্ববর্তী ধ্বনি/ধ্বনিগুচ্ছকে বেশি প্রভাবিত করে?

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৪**

মূল শিখনীয় বিষয়

বাংলা উচ্চারণ : উচ্চারণ রীতি

বাংলা কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষার উচ্চারণ বানান ভিত্তিক নয়। বাংলার সুপ্রচুর শব্দের উৎস ও গঠন বিচারে প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হতে পারে - কিন্তু উচ্চারণ নির্ভর করে অন্তিমে বাংলার নিজস্ব ধ্বনি-বিন্যাস বা ধ্বনি-পদ্ধতির ওপর। আবার, এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলোতে বর্ণের ব্যবহার থাকলেও ধ্বনির ব্যবহার নেই- অর্থাৎ বর্ণমালা আর ধ্বনি-পদ্ধতির সুসামঞ্জস্য নেই।

শিক্ষক প্রমিত বাংলার উচ্চারণ শিক্ষার্থীকে শেখাবেন, অনুশীলন করাবেন এবং নিজেও চর্চা করবেন। প্রমিত বাংলা হলো সকল অঞ্চলের মানুষের কাছে বোধগম্য এবং গ্রহণযোগ্য একটি ভাষিক প্রকাশ যা সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষণীয় হিসেবে ব্যবহৃত এবং বিশুদ্ধ।

শুদ্ধ উচ্চারণ ছাড়া শুদ্ধভাবে ভাষা বলা, পড়া ও লেখা সম্পূর্ণ হতে পারে না। এই সচেতনতা থেকে শিক্ষার্থীদেরকে প্রমিত উচ্চারণরীতি শেখানো প্রয়োজন। শিক্ষকের ধৈর্য, আগ্রহ ও সহানুভূতি এক্ষেত্রে সফলতা আনবে। কিন্তু এর জন্য শিক্ষককে যথাযথ জ্ঞান ও কৌশল আয়ত্ত করে তৈরি হতে হবে।

উচ্চারণ শিক্ষাদান ও চর্চার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে জানতে হবে। উচ্চারণসমস্যার স্বরূপ নিহিত আছে যেসব ক্ষেত্রে সেগুলো হলো : বর্ণের ও লেখ্যরূপ এবং উচ্চারণবিভিন্নতা, যুক্তবর্ণ ঘটিত শব্দের উচ্চারণ জটিলতা, সমোচ্চারিত শব্দের বনান ও অর্থের ভিন্নতা, সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণ, উচ্চারণ আছে বর্ণ নাই, আঞ্চলিকতাজনিত উচ্চারণ সমস্যা, বাগ্‌যন্ত্রের ত্রুটি ইত্যাদি। শিক্ষকের অন্তত প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে বাগ্‌যন্ত্রের গঠন ও কার্যপ্রণালী এবং তদনুযায়ী নির্দিষ্ট ধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে।

লেখা ও প্রমিত উচ্চারণে অনুশীলন করার জন্য কিছু ধ্বনিবিজ্ঞানগত মৌলিক ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। বাংলায় ৫০টি বর্ণচিহ্ন থাকলেও মৌলিক ধ্বনি ৩৮টি - স্বয়ম্ভূ অবারিত উচ্চারণের স্বরধ্বনি ৭টি (মতান্তরে ৮টি), স্বরধ্বনির সহায়তায় উচ্চারিত ব্যঞ্জনা সৃষ্টিকারী ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। শব্দের প্রতিটি বর্ণের/যুক্ত বর্ণের বা অক্ষরের আলাদা/স্বতন্ত্র উচ্চারণ হয় না- বরং উচ্চারণ সংঘটিত হয় সার্বিকভাবে। তাতে অনেক ধ্বনিই পার্শ্ববর্তী ধ্বনি/ধ্বনিগুচ্ছের দ্বারা প্রভাবিত হয় (ঘটে সমীভবন)।

মূল্যায়নঃ

১. উচ্চারণ বলতে কী বোঝায় শুদ্ধ উচ্চারণ রীতির প্রয়োজনীয়তা কী?

২. উচ্চারণ সংক্রান্ত সমস্যা কী-কী বলে চিহ্নিত করা যায়?

৩. বাংলা উচ্চারণরীতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য কী প্রকার পূর্ব-জ্ঞান এবং বিবেচনা প্রয়োজন?

৪. নিম্নে বর্ণিত শব্দগুলোর যে কোনো ১০টির প্রকৃত উচ্চারণ বাংলা বর্ণমালার সর্বাধিক সুবিধা নিয়ে, যথাসম্ভব কাছাকাছি-রূপে লিপিবদ্ধ করুন (পর্ব-৪ এর তালিকায় বর্ণীকরণের মত করে) :

শব্দ, অত্যন্ত, নিন্দা, ত্রুটি, পদ্ধতি, অবলম্বন, সার্থক, কিন্তু, শিক্ষার্থী, ক্রম, ঐশ্বর্য, বস্তু, সুষ্ঠু, শিক্ষক, ঊর্ধ্ব, যুক্তাক্ষর, বন্টন, ঠাণ্ডা, সংস্কৃত, বিজ্ঞান, অন্তর্নিহিত, বাঙালি, রঙিন, বর্জনীয়, সৌন্দর্য, স্ত্রীলিঙ্গ, সংক্ষিপ্ত ইত্যাদি।

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক :

- শুদ্ধ উচ্চারণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।
- বর্ণ, বানান ও উচ্চারণের বিসঙ্গতি থাকবেই, কিন্তু উচ্চারণ মান-অনুযায়ী হতে হবে।
- শুদ্ধ উচ্চারণ ও ভাষা-সৌকর্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।
- বাংলা শিক্ষকের শুদ্ধ উচ্চারণ-জ্ঞান ও চর্চা তাঁর ব্যক্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

পর্ব-খ :

- উচ্চারণ যে শিশুকাল থেকে শিখলে ভাল হয়, এটা বলা যেতে পারে।
- জন্মগত ভাবে যাদের বাগ্‌যন্ত্রের অসুবিধা রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে করণীয় বর্ণিত হতে পারে।
- উচ্চারণের কিছু চিরকালীন নিয়ম থাকলে সেগুলো বর্ণিত হতে পারে।

পর্ব-গ

- উচ্চারণ ব্যক্তি ও পরিবেশ ভেদে বিভিন্ন হতে পারে।
- রেডিও, টিভি এবং গণমাধ্যমে ব্যবহৃত প্রমিত উচ্চারণ এবং বিশেষ করে বিখ্যাত 'বাচন-ব্যক্তিত্ব'-কে (যাঁদের বাচন/উচ্চারণ সুন্দর, আকর্ষণীয়) অনুসরণ/অনুকরণ করে অভ্যাস করা।
- যথাসম্ভব কাছাকাছি উচ্চারণের অনুশীলন করানো যেতে পারে -- কোনো রূপ মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে।

পর্ব-ঘ :

* বর্ণমালার প্রাথমিক বা মূল উচ্চারণ ধরে যুক্তবর্ণের উচ্চারণসহ সমগ্র শব্দটিতে ধ্বনি-সাযুজ্য রক্ষা করা।
* কোথায় অভিশ্রুত-ও' এবং কোথায় তিন 'শ' প্রকৃত পক্ষে দন্ত্য-স এবং তালব্য-শ উচ্চারিত হবে তা খেয়াল করা।
* ই, ঈ, উ, ঊ জাতীয় স্বরধ্বনি 'অ' ধ্বনিকে অভিশ্রুত-ও' করে ফেলে, কোনো ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ও' হয়। শব্দান্তে বেশির ভাগ 'অ' লোপ পায় - বিশেষ করে তদ্ভব শব্দের কথ্য উচ্চারণে।

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৫**

বাংলা উচ্চারণ : সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ রীতি

সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের স্বরূপ

বাংলা ভাষায় বেশকিছু শব্দ রয়েছে যা উচ্চারণের সময় মুখ-বিবর সংকুচিত থাকে; এগুলোকে সংবৃত (closed) স্বর বলে। যেমন- 'উ', উচ্চারণ করলে মুখবিবর সংবৃত থাকে। অন্যদিকে এমন কতগুলো স্বর রয়েছে যেগুলো আমরা উচ্চারণের সময় মুখবিবর প্রসারিত করে বা খুলে তা উচ্চারণ করি। এসব ধ্বনিকে বিবৃত (open) স্বর বলে। যেমন- আ, এ, অ ইত্যাদি ধ্বনি। বাংলায় অর্ধ সংবৃত এবং অর্ধ বিবৃত স্বরও রয়েছে কয়েকটি। উচ্চারণের এই স্বর রূপের ওপর নির্ভর করে বাংলা ভাষা উচ্চারণে ও বলনে যুক্ত হয়েছে একটি ভিন্ন সৌকর্য। এটি বাংলার প্রমিত রূপকে শ্রুতিমধুর, তির্যক ও প্রবহমান করেছে। এরূপ ধ্বনির সঠিক উচ্চারণ না হলে অর্থের পার্থক্য ঘটতে পারে।

সংবৃত উচ্চারণের উদাহরণ : উট, লেখা, পথে, প্রেম, ওঠ।

বিবৃত উচ্চারণের উদাহরণ : এখন (এ্যাখোন), কেন (ক্যানো), যেন (জ্যোনো)।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি -

- বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণরীতি পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা।
- সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণরীতির স্বরূপ নির্ণয় করা ।
- প্রমিত উচ্চারণরীতিতে সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণরীতি বিশ্লেষণ ও অনুশীলন করা।
- শুদ্ধভাবে সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ পারগতা অর্জন ও অব্যাহত চর্চা (বলন ও পঠনভিত্তিক কার্য সম্পাদন) করা।

পর্বসমূহ

পর্ব-ক : সংবৃত ও বিবৃত ধ্বনির প্রকৃতি বা স্বরূপ

এর আগের অধিবেশনে আপনি বাংলা ধ্বনির প্রকার ভেদ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করেছেন। স্বরধ্বনির প্রকৃতি ও উচ্চারণে বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পর্কে এখন থেকে বিশেষ করে খেয়াল রাখতে হবে।

স্বরধ্বনি উচ্চারণ বিচারে ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভাল করে খেয়াল করলে আপনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, বাংলা স্বরধ্বনিগুলো উচ্চারণ কালে কয়েকটি ধ্বনির বেলায় ঠোঁট সংকুচিত এবং চোয়াল তথা মুখ প্রায়-বদ্ধ থাকে, কিন্তু অন্য কয়েকটি ধ্বনির বেলায় মুখ খুলে যায়, চোয়াল এবং ঠোঁট প্রসারিত হয়। ঠোঁট ও চোয়ালের এরূপ অবস্থা ভেদে (খোলা থাকা বন্ধ থাকা, প্রসারিত বা সংকুচিত থাকা) স্বরধ্বনি উচ্চারণের গুণাগুণ অনেকাংশেই নির্ভর করে। এগুলোর মাত্রাভেদে ধ্বনিবিজ্ঞানীগণ বাংলা স্বরধ্বনিকে (১) সংবৃত (Closed) (২) বিবৃত (Opened) (৩) অর্ধ-সংবৃত (Half-closed) (৪) অর্ধ-বিবৃত (Half-opened)- এরূপ ভাগ উপ-বিভাগে বিবেচনা করেন।

এখানে প্রদত্ত ছকটি পর্যবেক্ষণ করুন। ছকটিতেই স্বরধ্বনিগুলোর এরূপ ভাগ, উপ-বিভাগ বিন্যস্ত হয়েছে।

ঠোঁটের উন্মুক্তির ছক

ঠোঁটের ও চোয়ালের অবস্থা	জিভের অবস্থা		
	সম্মুখ	মধ্য	পশ্চাৎ
সংবৃত	ই		উ
অর্ধ-সংবৃত	এ		ও, ও’
অর্ধ-বিবৃত	এ্যা/অ্যা		অ
বিবৃত		আ	

বাংলা স্বরধ্বনি

একটা বিষয় অনুধাবন অত্যাবশ্যক যে, ঠোঁটের সংকোচন-প্রসারণ এবং চোয়ালের উন্মু ক্তি সাধারণত-যুগপৎ ঘটে (ব্যতিক্রম ছাড়া)।

বাংলা শব্দে এসব ধ্বনির উদাহরণ :
সংবৃত উচ্চারণ : লিখি, দিঘী, উট, শুধু ইত্যাদি।
অর্ধ-সংবৃত উচ্চারণ : লেখে, দেবে, ওকে, এও ইত্যাদি।
অর্ধ-বিবৃত উচ্চারণ : অমন, অতি, এ্যাকটা, ক'নে (বিয়ের ক'নে)
বিবৃত উচ্চারণ : আজ, আমার, আবাস ইত্যাদি।

এখন আপনি নিজে চিন্তা করে কি আর কিছু এখানে যোগ করতে পারেন?

পর্ব-খঃ সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ রীতি

স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে :

সংবৃত ও বিবৃত ব্যাপারটি প্রাথমিক ভাবে স্বরবর্ণ/স্বরধ্বনির ক্ষেত্রেই কার্যকর। তার মধ্যে আবার দু'একটি স্বরের বেলায় বিশেষ যত্নবান হতে হয়, যেমন - 'অ', 'এ' এবং 'এ্যা/অ্যা'।

'অ' ধ্বনির বিবিধ উচ্চারণ

বাংলায় অ-ধ্বনিটির যেমন বিবিধ (varied) উচ্চারণ হয় এমনটি আর কোনোটির বেলায় হয় না। ইতোপূর্বে আপনারা জেনেছেন যে, অ-এর অন্তত দুই প্রকার উচ্চারণ আছে – স্বাভাবিক (অর্ধ-বিবৃত) এবং অভিশ্রুত (অর্ধ-সংবৃত)। কিন্তু অনুপুঙ্খ বিবেচনায় অ-এর উচ্চারণের বিচিত্র পরিস্থিতি ও ধ্বনিরূপের তালিকা করা যেতে পারে।

- অ-এর স্বাভাবিক উচ্চারণ পাওয়া যায় শব্দের প্রথমে বা মধ্যে ব্যঞ্জনের সঙ্গে নিহিত অবস্থায় থাকলে। যেমন- অজ (অজো পাড়া গাঁ), অল্প। শব্দারম্ভে 'নঞ্'-অর্থক অব্যয় হিসেবে যুক্ত থাকলে-- অঢেল, অচল, অনাচার ইত্যাদি শব্দে।
  না-বাচক উপসর্গ হিসেবে শব্দের প্রথমে অ থাকলেও উচ্চারণ অপরিবর্তিত থাকে। যেমন - অসীম (অশিম), অবিচার, অনিবার্য (অনিবার্জো) ইত্যাদি শব্দে।
- অ-এর অভিশ্রুত উচ্চারণ পাওয়া যায় অ-এর পরে উচ্চ স্বরধ্বনি ই/ঈ, উ/ঊ থাকলে অথবা দ্বিতীয় অক্ষরে য-ফলা (্য) থাকলে। যেমন - অতি (ও'তি), সতী (স'তি), মধু (ম'ধু), সত্য (শ'ত্তো), সন্ধ্যা (শ'ন্ধা)।

এগুলো ছাড়া, সূক্ষ্ম বিবেচনায় আরো প্রায় ১৬টি ক্ষেত্রে অ-এর অভিশ্রুত উচ্চারণ হতে পারে।

* একাক্ষরিক শব্দের শেষে ন (ণ) থাকলে : বন [ব'ন]; শেষে যুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে : বক্ষ [ব'ক্খ'] --কিন্তু যক্ষ্মা বা অজ্ঞ শব্দে হয় না; সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনে : জনস্রোত [জন'স্রোত্], গণতন্ত্র [গন'তন্ত্র']; কিছু ধনাত্মক শব্দের নিহিত ব্যঞ্জনে : থরথর [থ'রথ'র], জরজর [জ'রজ'র]।

'এ' ধ্বনির পার্থক্যসূচক উচ্চারণ

- সাধারণত শব্দের প্রথমে, মধ্যে ও শেষে এ-ধ্বনির কোনো বিভ্রাট ঘটে না। তেমনি পরে উচ্চ স্বরধ্বনি থাকলেও শব্দের প্রথমের এ-ধ্বনির স্বাভাবিক অর্ধ-সংবৃত উচ্চারণ বজায় থাকে। যেমন - পথে, দলে, আগে, অনেক, এসেছে, একটি, দেখি, তেলি, ঢেঁকি, বেলি।

- কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে এ-বর্ণের উচ্চারণ অর্ধ-বিবৃত (এ্যা/অ্যা) হয়। যেমন - এক (এ্যাক), দেখা (দ্যাখা), এখন (এ্যাখন/এ্যাখ'ন), তেলাপোকা (ত্যালাপোকা), ফেল (ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকানো), যেমন (জ্যাম'ন) ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে

সরাসরি সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ বিবেচনায় ব্যঞ্জন আসে না। তবে শব্দের ব্যঞ্জন যেহেতু স্বরধ্বনি সহযোগেই উচ্চারিত হতে হয়, তাই সামগ্রিক উচ্চারণে ব্যঞ্জনধ্বনিমূলক অক্ষর (সিলেবল) সংবৃত-বিবৃত উচ্চারণের আওতায় সংশ্লিষ্ট থাকে।

এখন আপনি নিজ থেকে কি কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারেন যেখানে উপরের নিয়মগুলোরও বাইরে কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে?

পর্ব-গঃ বলন ও উচ্চারণ ভিত্তিক কার্যক্রম

উচ্চারণ যেহেতু কথ্য-প্রক্রিয়া (বলন) সেহেতু উচ্চারণ অনুশীলন করে শেখার কোনো বিকল্প নাই। প্রকৃত ফল লাভের জন্য তা সুনির্দিষ্ট এবং দীর্ঘ মেয়াদি ও প্রশিক্ষক-পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে বর্তমান মডিউলে প্রাথমিক সহায় হিসেবে একটা নমুনা দেয়া হচ্ছে —এরূপ উদ্দেশ্যে যে শিক্ষকগণ এখান খেকে প্রাথমিক প্রসম্ভার (input) লাভ করে সুযোগ মত স্ব-উদ্ভাবনায় এবং সম্ভব হলে প্রাযুক্তিক সহায়তায় বাংলা উচ্চারণ পারগতা/সামর্থ অর্জনে সহায়তা করতে পারবেন।

নিচের ছক থেকে প্রথমে পৃথক-পৃথক শব্দের উচ্চারণ উৎকর্ষ অনুশীলন করতে এবং করাতে হবে। তারপর শব্দ বাক্যে প্রযুক্ত হলে, বাক্প্রবাহের অন্তর্গত হয়ে সেগুলোর যে সামগ্রিক ধ্বনি সৌকর্য লাভ করা যায়, তার অনুশীলন প্রয়োজন হবে।

সারণী-ক : সংবৃত ও বিবৃত উচ্চার্য শব্দাবলি

ই/ঈ : উচ্চ, সম্মুখ সংবৃত স্বর। লিপিতে বা বর্ণে হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ যা-ই লেখা হোক না কেন এর উচ্চারণে প্রাথমিকভাবে কোনো ব্যতিক্রম হয় না। তবে, বর্ণে থাকলেও বাংলায় যদিও কোনো দীর্ঘ উচ্চারণ নাই, কিন্তু স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ প্রাধান্য পায় যখন উচ্চারণ ভেদে শব্দের অর্থ প্রাধান্য পায়।

দায়ী [দায়ি], মানবী [মানোবি], মনীষী [মোনিশি], তরী [তোরি], বীর [বির]।

কিন্তু, চিৎ [চিত্] -চিত্ত, পরাজিত অর্থে, অথচ, ধীর [ধির] - মন্থর, স্থির, শান্ত অর্থে
চির [চির্] -বিদারণ, খণ্ড অর্থে ধীশক্তি [ধীশোক্তি] - বুদ্ধিশক্তি অর্থে
চির [চিরো] - নিত্য, অনন্ত অর্থে
চীর [চীর্] - ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড অর্থে

এ : উচ্চ-মধ্য, সম্মুখ, অর্ধ-সংবৃত। দেখি [দেখি] বনাম দেখা [দ্যাখা]
তেল [তেল্] " তেলান [ত্যালানো]
বেল [বেল] " বেলা [ব্যালা] ।

কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে : কিছু শব্দের উচ্চারণে কিঞ্চিৎ তফাত আছে, যেমন -
বেলা - 'সকাল বেলা',
বেলা - 'রুটি বেলা',
বেলা - 'সমুদ্রের বেলাভূমি'।

এ্যা : নিম্ন, মধ্য ও বিবৃত স্বর। ব্যর্থ [ব্যার্থো], ব্যাকরণ [ব্যাকরন্], জ্ঞাতি [গ্যাঁতি] ইত্যাদি।

আ : নিম্ন, মধ্য ও বিবৃত স্বর এবং ও : উচ্চ-মধ্য, পশ্চাত, অর্ধ-সংবৃত ধ্বনি।
এই দুটি ধ্বনি শব্দের প্রথমে, মধ্যে এবং শেষে -- সর্বত্রই অবিকৃত থাকে।

উ/ঊ : পশ্চাত্য, উচ্চ, সংবৃত স্বরধ্বনি। বর্ণমালায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ দুটো রূপই আছে। তা থাকলেও দীর্ঘ-ঊ'র উচ্চারণ প্রকৃত পক্ষে বাংলা বাক্য উচ্চারণে ঘটে না।

অ : পশ্চাত, নিম্ন ও অর্ধ-বিবৃত স্বরধ্বনি । স্বভাবতই এটির ব্যাপারেই সর্বাধিক নজর দেয়া হয়- যা ইতোমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে।

স্বাভাবিক উচ্চরণ : হ্রদ [হ্রদ্], হ্রস্ব [হ্রশ্শো], দৌড় [দউড়্], পৌষ [পোউশ্]।

অভিশ্রুত উচ্চারণ : পাগল [পাগোল্], প্রভাত [প্রোভাত্], রক্ষা [রোক্খা], অজ্ঞ [অগ্ গোঁ], তত [ততো], প্রান্ত [প্রান্তো], প্রীত [প্রিতো], মূলত [মুলোতো], ক্রমশ [ক্রোমোশো], প্রবাহ [প্রোবাহো], স্নেহ [স্নেহো], করছ [করছো], শ্রেয় [স্রেয়ো], তদীয় [তদিয়ো], গ্রন্থ [গ্রোন্থো], ষোল [শোলো], ক্ষুদ্রতর [খুদ্রোতরো], কৃত [ক্রিতো]।

ব্যঞ্জন বর্ণে গঠিত শব্দ উচ্চরণ অনুশীলন (নমুনা):

কণ্ঠ বর্ণে গঠিত শব্দ :- কণ্ঠ, গণ্ড, ঘণ্টা ইত্যাদি

ক	-	কণ্ঠ	-	কন্‌ঠো
	-	কণ্ঠস্থ	-	কন্‌ঠোস্‌থো
	-	কটু	-	কোটু
	-	করলা	-	করোলা
	-	কথক	-	কথোক্‌
খ	-	খই	-	খোই
	-	খড়ম	-	খড়োম্‌
	-	খাতাবন্দি	-	খাতাবোন্‌দি
	-	খনখনে	-	খন্‌খোনে
	-	খোলশ	-	খোলোশ
গ	-	গণন	-	গনোন্‌

তালব্য বর্ণে গঠিত শব্দ :- চঞ্চল, ছাত্র, জামা ইত্যাদি

মূর্ধন্য বর্ণে গঠিত শব্দ :- টনটন, ঠনঠন, ঠাণ্ডা ইত্যাদি

ওষ্ঠ বর্ণে গঠিত শব্দ :- পুষ্প, ফুল, ফসল, মামা ইত্যাদি

সারণী-খ : সংবৃত ও বিবৃত উচ্চার্য শব্দাবলী বাক্যে প্রযুক্ত

১। অবশ্যই বই পড়ে আসবে। বউ, কাল আমরা খই আর মধু খাব।

২। অতি ছল অতি খল অতীব কুটিল। ঔষধ অবান্তর, পদ্যও তাই।

৩। বলতে চাইছে, বলছে।

৪। ঘরের জানালায় স্বচ্ছ কাচ সহ্য হয় না।

৫। লক্ষ্য যদি স্থির থাকে তবে এ কক্ষে বসেই তুমি পক্ষকালের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবে।

৬। বোস। তুমি কাজ করবে, ভাল করে কর। ঠিক মত পড়।

৭। আজ প্রভাতে প্রকাশিত হল দামবৃদ্ধির প্রবণতা।

৮। 'তখন আমায় নাইবা মনে রাখলে'।

৯। বাসনা, যাতনা, বারণ, রচনা, রসনা, নিয়ম, যখন, তখন – এগুলো খেয়াল করে উচ্চারণ করতে হবে।

১০। রিক্ততা, ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা– এসব বলে লাভ নেই।

১১। আমায় ও ডাকল, 'অল্প করে গল্প করি।' বলল, 'ভাগ্য আমার, কী আর বলব, তুমি সবই জেনেছ, শক্ত কথা –। কী বল ?'

১২। চেষ্টা করলে অদূর ভবিষ্যতে অভাব অনটন অপসারিত হবে।

১৩। স্পষ্ট, স্তব্ধ, শব্দ, স্বপ্ন- এগুলোর উচ্চারণ খেয়াল কর।

১৪। খেল, তবে একটা খেলনাও যেন ভেঙ না। একটি করে গুছিয়ে রাখবে।

< বেলা⟶ বেলাভূমি, বেলা ⟶ সকাল ব্যালা, বেলা ⟶ রুটি ব্যালা। >

১৫। অনুশুচনা নয়, বল 'অনুশোচনা, এক কুটি নয় -- 'এক কোটি'।

এই পর্বে বর্ণিত প্রক্রিয়া/পদ্ধতিতে অনুশীলনের জন্য কোন প্রকার শিক্ষাদান কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

ইউনিট ২ **অধিবেশন ৫**

মূল শিখনীয় বিষয়
সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ

স্বরধ্বনি ছাড়া যেহেতু ব্যঞ্জন উচ্চারিত হতে পারে না এবং স্বরধ্বনিই অক্ষর (সিলেবল) গঠন করে, প্রকৃত পক্ষে শব্দের/বাক্যের উচ্চারণকে সম্ভব করে তোলে সেহেতু স্বরধ্বনির গুণাগুণ এবং বচনে তার সংস্থান উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রহস্য। উচ্চারণ কৌশল যথাযথ আয়ত্ত করতে হলে অতএব স্বরধ্বনির উচ্চারণ প্রকৃতি জানা অত্যাবশ্যক।

স্বরধ্বনি-সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের ক্ষেত্রে 'সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ' এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। কতিপয় স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট ও চোয়াল সংকুচিত হয়, কোনোটার ক্ষেত্রে হয় না। এগুলো যথাক্রমে 'সংবৃত' ও 'বিবৃত' স্বরধ্বনি। ঠোঁটের সংকোচন এবং চোয়ালের/মুখের উন্মুক্তির পরিমাণ ও স্বরূপ বিবেচনায় বাংলা স্বরধ্বনিগুলোকে সংবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধ-বিবৃত, বিবৃত- এরকম ৪ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উচ্চারণের এই রূপভেদের উপর নির্ভর করে বাংলা ভাষা উচ্চারণে ও বলনে যেমন যুক্ত হয়েছে একটি ভিন্ন সৌকর্য তেমনি এগুলোর হেরফেরে ঘটে যায় অর্থের পার্থক্য।

সংবৃত এবং বিবৃত উচ্চারণ ঘটে মূলত স্বরধ্বনির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ঘটে 'অ', 'এ' এবং 'এ্যা/অ্যা'-র ক্ষেত্রে। 'অ' ধ্বনির উচ্চারণে যত বিবিধ পরিবর্তন হয় তেমনটি আর কোনো ধ্বনির বেলায় ঘটে না। অ-এর যেহেতু অন্তত দুই শ্রেণীর উচ্চারণ আছে- স্বাভাবিক এবং অভিশ্রুত- তাই উচ্চারণ শিক্ষণে বিশেষ গুরুত্বের শব্দের শ্রেণীকৃত তালিকা থেকে উচ্চারণ অনুশীলন অত্যাবশ্যক। কোথায় স্বাভাবিক উচ্চারণ আর কোথায় অভিশ্রুত উচ্চারণ (অ এবং ও ধ্বনির মাঝামাঝি ও' উচ্চারণ) এগুলো ১৬/১৭ প্রকার নমুনা ব্যতিক্রমসহ অনুশীলন প্রয়োজন।

'এ' ধ্বনির পার্থক্যসূচক উচ্চারণ ব্যতিক্রমসহ অনুশীলন করতে হবে। মূল শিখনীয় হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যতিক্রম বাদ দিলে সাধারণভাবে 'অ' এবং 'এ' ধ্বনির পর উচ্চ-স্বরধ্বনি (যথা - ই/ঈ, উ/ঊ) থাকলে এদুয়ের স্বাভাবিক উচ্চারণ উচ্চ-স্বরের সঙ্গে সমীভূত হয়। আবার, বাংলা বর্ণমালায় দীর্ঘ ঈ/ঊ থাকলেও প্রকৃত উচ্চারণে এগুলো হ্রস্ব হয়ে থাকে (তবে, অর্থের পার্থক্য বোঝাতে কোথাও দীর্ঘ উচ্চারণ প্রয়োজন হয়)।

উচ্চারণ কথ্য-প্রক্রিয়া বিধায় তা অনুশীন করে শেখার কোনো বিকল্প নেই। অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অনুশীলন হলে ভাল হয়। তবে, সাধারণভাবে পৃথক শব্দ এবং বাক্যে ব্যবহৃত শব্দ হিসেবে অনুশীলন করা যেতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১. সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের মূল ব্যাপারটি কী?
২. সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে কোন দিকটির প্রতি বেশি খেয়াল রাখতে হবে?
৩. কোন-কোন স্বরধ্বনির মূল উচ্চারণে ব্যত্যয় ঘটে না, আর কোন-কোনটির ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম বা বেশি পরিবর্তন ঘটে?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-ক :

- সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তা করে ২/৩টি করে উদাহরণ দিতে বলা যায়।
- এসব উচ্চারণ সম্বলিত কিছু শব্দ বোর্ডে লিখে যথাযথ উচ্চারণের সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া যায়।
- শিক্ষক নিজে এমন কিছু শব্দ নির্বাচন করতে পারেন যেখানে একই সঙ্গে একাধিক-রূপ উচ্চারণের উদাহরণ আছে; যেমন - নিজেরা, ব্যাষ্টিতে, লিয়াকত।

পর্ব-খ :

- পরে উচ্চ স্বরধ্বনি থাকলেও এ পরিবর্তিত হয়ে এ্যা/অ্যা হয় : একাকী [এ্যাকাকি]
- যুক্ত ব্যঞ্জনের এ-কার সব সময় বিশুদ্ধ এ রূপে উচ্চারিত হয় : শ্রেষ্ঠ [স্রেশ্‌ঠো]
- হ দিয়ে শেষ হলে সেসব শব্দের প্রথম এ অবিকৃত থাকে : দেহ [দেহো]

পর্ব-গ :

শিক্ষক শ্রেণীতে শুদ্ধ উচ্চারণে শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বলবেন। শিক্ষার্থীদের শুদ্ধ উচ্চারণ করতে বলবেন এবং প্রয়োজনে উচ্চারণ সহায়তা দিবেন।

১. শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ বর্ণ বা ধ্বনির উচ্চারণে সমস্যা হলে তা চিহ্নিত করে উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন।
২. যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণ করতে বলবেন এবং নিজে বোর্ডে লিখবেন।
৩. শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে শব্দগুলো উচ্চারণ করে শোনাবেন ও উচ্চারণ অনুশীলন ও ফলাবর্তন করবেন। উচ্চারণে আঞ্চলিকতা অবশ্য পরিহার্য।
৪. প্রদত্ত শব্দসমূহ বাক্যে ব্যবহার করে তার আলোকে অনুশীলন ও ফলাবর্তনে শিক্ষক সহায়তা দেবেন।